গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১৮ জুন, ২০০৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

অনাহারে মৃত্যু

মালিকতোষণ ও গরিবনিধন রাজনীতির পরিণাম

পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম আমলাশোলে দিনের পর দিন না খেয়ে মানুষ মরল শুধু নয়, সিপিএম শাসনে মন্ত্রী, নেতা ও প্রশাসনের মধ্যে মনুষ্যত্বের কী মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে, তাও পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেল। নিজের প্রশাসনের রিপোর্ট অস্বীকার করতে না পেরে মুখ্যমন্ত্রী বলতে বাধ্য হলেন — ওইসব এলাকায় অনাহারে মৃত্যুর মতো পরিস্থিতি রয়েছে। কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর কথা তিনি অস্বীকার করেছেন। রাজ্যে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নের জন্য মন্ত্রী রয়েছেন রামেশ্বর মুর্মু। গণশক্তির বয়ান অনুযায়ী (১৩-০৬-০৪) তাঁকে মৃত সনাতন মুড়ার স্ত্রী জানিয়েছেন মৃত্যু অনাহারে হয়নি, সেদিনই ঘরে সাত মন চাল ছিল। সনাতনের শ্রাদ্ধে ছয়শো জন নিমন্ত্রণ খেয়েছেন। কী করতেন সনাতন ? গণশক্তিই লিখছে তিনি গরু চরাতেন। গরু চরিয়ে তাঁর পরিবার দিনে আড়াই কিলো চাল আয় করত। এছাড়া বাবুই ঘাসের দড়ি বানিয়ে বিক্রি করত সনাতন। এই যাদের আয়, তাদের ঘরে শ্রাদ্ধে ছয়শো লোক কী করে খেতে পারে তা গণশক্তিই বলতে পারে। আসলে সত্য চাপা দিতে তাঁরা লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়েছেন। মার্কসবাদ, বামপন্থা দূরে থাক, ন্যূনতম মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে মন্ত্রীরা প্রমাণ করতে বসেছেন অনাহারে নয় — অপুষ্টিতে, যক্ষ্মায়, জন্ডিসে তারা মারা গিয়েছে। যেন অপুষ্টিতে ও বিনা চিকিৎসায় মরলে তার দায় সরকারের নয়; দায় গরিব মানুষের, দায় যে মরেছে তার।

এই একই সুর এদেশে একদিন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের গলায়

দুয়ের পাতায় দেখুন

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অনাহারী মানুষকে বাঁচানোর জন্য দাবি জানাল এস ইউ সি আই

পশ্চিম মেদিনীপুরের আমলাশোলে গরিব গ্রামবাসী মানুষের অনাহারে মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর ব্যথা ও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১২ জুন এক বিবৃতিতে বলেন —

“এটা অত্যন্ত লজ্জার যে, ন্যূনতম মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা অতীতের ব্রিটিশ ও কংগ্রেস শাসকদের মতোই মর্মান্তিক অনাহার-মৃত্যুর ঘটনাকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে ও নিজেদের ধনিকতোষণ ও গরিবনিধনের চূড়ান্ত অমানবিক চেহারাটাকে আড়াল করতে চাইছেন। এজন্য দলীয় ও প্রশাসনের কর্তাদের দিয়ে ভয় দেখিয়ে গরিব মানুষের মুখ বন্ধ করাতে এবং অসত্য কথা বলাতেও তাদের বিবেকে আটকাচ্ছে না।

এই মর্মান্তিক মৃত্যু, মুষ্টিমেয় ধনীদের জন্য ‘উন্নয়নে’র তলায় চাপা পড়া শোষিত মানুষের জীবনের অসীম যন্ত্রণাকেই উদঘাটিত করেছে।

এই ঘটনা শুধু আমলাশোলেই নয়, অনাহার জর্জরিত চা-বাগান শ্রমিক, বন্ধ কারখানার শ্রমিক, খেতমজুর ও গরিব চাষীর জীবনেও প্রতিদিন ঘটে চলেছে। এর দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারে না। অথচ ঝানু বুর্জোয়া দলের মতো এই সমস্ত ঘটনার পিছনে প্রকৃত সত্য চাপা দেওয়ার হীন রাস্তা তাঁরা নিয়ে চলেছেন। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন ও এই নির্মম মৃত্যুমিছিল রোধের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় খাদ্য, ঔষধ সহ মানুষকে বাঁচাবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।”

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন দপ্তরে বিক্ষোভ

সিইএসসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, শুনানি করে নতুনভাবে ২০০৪-০৫ সালের মাশুল নির্ধারণ, বকেয়ার বোঝা প্রত্যাহার, তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপের নীতি বা অভিন্ন মাশুলনীতি প্রত্যাহার, সিইএসসি’তে প্রচলিত স্ল্যাব বিন্যাস চালু রাখা, কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ, জনস্বার্থবিরোধী রেগুলেশন প্রত্যাহারের দাবিতে ১১ জুন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক বেলা ৩টা নাগাদ সল্ট লেকে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অফিস অবরোধ করে দীর্ঘ ২ ঘণ্টা বিক্ষোভ জানান। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল কমিশনের চেয়ারম্যানের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে প্রতিনিধিরা চেয়ারম্যানের ঘরেই বিক্ষোভ অবস্থান করতে থাকেন। দীর্ঘক্ষণ পরে, অ্যাসোসিয়েশনের দাবি বিচার করে দেখা হবে এই প্রতিশ্রুতি চেয়ারম্যান দিলে ঘেরাও প্রত্যাহার করে নিয়ে পৌরভবনের তলায় এক গ্রাহক সমাবেশে সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, বিগত লোকসভা নির্বাচনের জনাদেশ হল বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি না করা এবং গরিব মধ্যবিত্ত ও কৃষককে কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। এই জনাদেশ মেনে বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যুতের দাম কমানো হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের নির্দেশে সাধারণ মানুষের উপর বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানো হয়েছে। বিরাট বকেয়ার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে জনগণের উপর, আর শিল্পপতিদের দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। একাজ করা হয়েছ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট-এর নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, প্রকাশ্য শুনানি বন্ধ করে। এ কাজ করা হয়েছে গোয়েঙ্কা-বৃহৎ শিল্পপতি এবং বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে। তিনি বলেন, অবিলম্বে এই বেআইনি, জনস্বার্থবিরোধী অর্ডার বাতিল করতে হবে, প্রচলিত স্ল্যাব বিন্যাস সিইএসসি’তেও চালু রাখতে হবে। আমরা ১৫ দিন সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে পরিবর্তন না হলে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন করা হবে।

বেলা ২টায় বিক্ষোভকারীরা বিদ্যুৎ পর্ষদ অফিসের সামনে জমায়েত হয়ে সেখান থেকে প্রখর রৌদ্রে মিছিল করে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অফিসে বিক্ষোভ জানাতে আসে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ আক্রমণ করে ও বেশ কিছু বয়স্ক মানুষ সহ আন্দোলনকারীদের আহত করে।

জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর সাথে আলোচনার জন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৯ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

“অন্ধ্রে নকশালপন্থী জনযুদ্ধ গোষ্ঠী নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তাদের সাথে আলোচনার জন্য বৈঠকের উদ্যোগ নিয়েছে, অথচ পশ্চিমবঙ্গে জনযুদ্ধ গোষ্ঠী বেআইনি ঘোষিত না থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সন্দেহবশে ও প্রচারপত্র রাখার অভিযোগে অনেককেই গ্রেপ্তার করেছে, বিনা বিচারে আটক রেখে অত্যাচার চালাচ্ছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি — (১) সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার ও পুলিশি হেপাজতে অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, (২) সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা চলবে না, (৩) বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, (৪) এই রাজ্যেও জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর সাথে আলোচনার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।”

১১ জুন সল্ট লেকে বিদ্যুৎ কমিশন দপ্তর অভিমুখে গ্রাহকদের মিছিল

নামখানা লোনাজলে প্লাবিত

বিডিওতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে সম্প্রতি বিস্তীর্ণ এলাকা লোনাজলে প্লাবিত হওয়ায় নদীবাঁধ মেরামত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে এস ইউ সি আই নামখানা লোকাল কমিটির উদ্যোগে গত ৯ জুন বিডিওতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, এই ব্লকের বুধাখালি, দেবনগর, ঈশ্বরীপুর, মদনগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় নদীবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা লোনা জলে প্লাবিত হয়েছে। মাঠের সবজি চাষ, পানের বরজ, পুকুরের মাছ ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েছে; ঘরবাড়ি হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে নয়তো লোনাজলের কবলে। পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট, মানুষ ও গবাদি পশু বিপন্ন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য বহু এলাকার নদীবাঁধ এমনই জীর্ণ যে, যেকোন মুহূর্তে সেগুলিও ভেঙে এলাকার পর এলাকা প্লাবিত হয়ে যেতে পারে।

এস ইউ সি আই-এর এক প্রতিনিধি দল প্লাবিত এলাকাগুলি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিপন্ন পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন। সংগৃহীত তথ্যাদি তুলে ধরে গত ৯ জুন নামখানা বিডিওতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং দাবি পেশ করা হয় যে, (১) ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধগুলিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামত করতে হবে, (২) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, (৩) প্লাবিত এলাকায় আটকে পড়া লোনা জলের দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়ে সংক্রামক রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, (৪) প্রতিটি এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট দূরীকরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, (৫) জীর্ণ নদীবাঁধগুলির স্থায়ী মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং (৬) নদীখাতের পলি সরিয়ে জলস্রোতকে সঠিক খাতে প্রবাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড হিমাংশু আদক, স্বপন রায় ও কমলেন্দু পাণি। বিডিও'র সঙ্গে আলোচনায় প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেড কমলেন্দু পাণি, অনিতা মাইতি, প্রজাপতি খালুয়া, দুধালি হালদার ও কঙ্কন দাস।

বিডিও জানান, নদীবাঁধ মেরামতির জন্য সরকার মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে — যা প্রয়োজনের এক শতাংশও নয়; ফলে প্রশাসন অসহায়। বিডিও'র বক্তব্যে প্রতিনিধিরা তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা জানান যে, প্রশাসনের অসহায়তা দিয়ে সর্বস্ব হারানো পরিবারগুলির দিন চলবে না। সরকার ও প্রশাসনের চূড়ান্ত উদাসীনতা ও অপদার্থতার জন্য মানুষের যে সর্বনাশ হয়েছে তার দায় সরকার ও প্রশাসনকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশাসন যদি যথাযথ ভূমিকা পালন না করে তবে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলে প্রশাসনকে দাবিপূরণে বাধ্য করা হবে।

আর জি করে ছাত্র আন্দোলনের জয়

আর জি কর মেডিকেল কলেজে এ আই ডি এস ও'র একের পর এক আন্দোলনের চাপে বিপর্যস্ত কর্তৃপক্ষ ডি এস ও'র তিনজন সংগঠককে গত ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে সাসপেন্ড করেছিল। আন্দোলনের চাপে এবং কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে রাজ্য সরকার সেই সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। যেকোন উপায়ে ডি এস ও সংগঠকদের কলেজ থেকে বের করে দিতে মরিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ এবার এক অভিনব দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে।

গত ৪ জুন আর জি কর মেডিকেল কলেজে হাউসস্টাফশিপ সিলেকশনের জন্য কাউন্সেলিং অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রসংসদের পক্ষ থেকে এটি পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে সার্জারী বিভাগে একটি আসন ফাঁকা হলে সেই আসনের যোগ্য দাবিদার ডি এস ও সংগঠক ডাঃ শুভজিৎ রায়কে বঞ্চিত করে গোপনে এস এফ আই-এর ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সম্পাদক ডাঃ সন্দীপ কুমার প্রামাণিককে অন্যায়ভাবে নিয়োগ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সার্জারি বিভাগে ডাঃ শুভজিৎ রায়ের মেরিট স্কোর ছিল ৩৮.৪, সেখানে ডাঃ সন্দীপ কুমার প্রামাণিকের ছিল ৩৭.৮। এছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি আসন ফাঁকা হলে সেই সমস্ত আসনে গোপনে এস এফ আই নেতাদের ঢোকানোর চক্রান্ত চলছিল।

এর প্রতিবাদে ডি এস ও'র উদ্যোগে জুনিয়ার ডাক্তার ও ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। প্রিন্সিপ্যাল ও কলেজ সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর কাছে স্মারকলিপি প্রদান ও জুনিয়ার ডাক্তারদের মধ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রচারাভিযান চালানো হয়। ছাত্র-জুনিয়ার ডাক্তার-শিক্ষক ও সর্বস্তরের কর্মচারীদের ব্যাপক সমর্থনে আন্দোলন বৃহত্তর রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ নতিস্বীকার করে ডি এস ও'র দাবি মেনে ডাঃ শুভজিৎ রায়কে সার্জারি বিভাগে হাউসস্টাফ হিসাবে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়।

গত ১৫ বছর ধরে ছাত্র সংসদের দ্বারা যেরকম অগণতান্ত্রিকভাবে হাউসস্টাফশিপ কাউন্সেলিং হয়ে আসছে, কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, এরপর ঐ পদ্ধতির পরিবর্তে কর্তৃপক্ষই দায়িত্ব সহকারে কাউন্সেলিং পরিচালনা করবে। এছাড়া ভবিষ্যতে কোন আসন শূন্য হলে সেখানে মেরিট স্কোরের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হাউসস্টাফ নিয়োগেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রসদনে ডি ওয়াই ও-র বিক্ষোভ

বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত রবীন্দ্রসদনে সরকারি অনুমোদনে অত্যন্ত অশ্লীল নাটক 'ঋতুসুখে বিবর্ণ কবিতা' মঞ্চস্থ করার প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও ১০ জুন সদনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। যুব সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্করের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সংস্কৃতি বিভাগের জয়েন্ট ডাইরেক্টর এবং রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দিয়ে বলেন, ''রাজ্যের সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত রবীন্দ্রসদনে সরকারি অনুমোদনে যেভাবে অশ্লীল নাটকের প্রদর্শন ঘটতে পারল তাতে আমরা স্তম্ভিত। রাজ্য জুড়ে নোংরা সিনেমা ও পত্রপত্রিকার অবাধ প্রসার, ড্রাগ, জুয়া, সাট্টার রমরমা ব্যবসা এবং মদের ঢালাও লাইসেন্সের মধ্য দিয়ে যুব সমাজের নৈতিকতা ও রুচি সংস্কৃতির যে অবনমন ঘটে চলেছে এই ঘটনা তাকেই আরো ত্বরান্বিত করবে।''

ALL INDIA
DYO
ALL INDIA
অশ্লীল নাটক
প্রদর্শনী হল কেন
সংস্কৃতিমন্ত্রী
মুখ্যমন্ত্রী
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
জবাব দাও
AIDYO

তাঁরা দাবি জানিয়েছেন, (১) অশ্লীল নাটক ও সিনেমার প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে, (২) বিকৃত রুচির নাট্যদল ও বিনোদন সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে, (৩) প্রগতিশীল নাট্যদল ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকে সরকারি হলে সুলভে অনুষ্ঠান করার সুযোগ দিতে হবে, (৪) মদের দোকান খোলার ক্ষেত্রে সরকারি উৎসাহ বন্ধ করতে হবে ও (৫) দেশের যুব সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থেকে সস্তা বিনোদন প্রসারের সরকারি প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও যুব সমাজকে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন।

মালিকতোষণ ও গরিবনিধন রাজনীতির পরিণাম

একের পাতার পর

শোনা যেত। মানুষের মৃত্যুতে শাসকদের নির্মম ঔদাসীন্যকে কশাঘাত করে প্রায় দেড়শো বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে লিখেছেন — ''মীরজাফর গুলি খায় আর ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়। ... লোকে না খাইয়া মরুক। খাজনা আদায় বন্ধ হয় না।'' এই ছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ছবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালেও শহরের রাজপথে ভুখা মানুষ প্রেতের চেহারা নিয়ে 'ফ্যান দাও' বলে অসহায় আর্তনাদ করত। ৫৬ বছরের স্বাধীনতা আর ২৭ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের পর আমলাশোলের কান্না বুঝিয়ে দিল গরিবের জীবনে আলো আসেনি কোনো। আজ সে আগের মতো দলে দলে শহরে আসে না, কারণ শহরের ফুটপাত, রেল লাইন, খালপাড়ে জায়গা নেই। সেখানে এসে ঠাঁই নিলেও আসবে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের বুলডোজার, পেলোডার। তাই আজ সে গ্রামে বসে চোখের আড়ালে তিলে তিলে মরে। চাকরি নেই, জীবিকা নেই; গরিবের জন্য সরকারি সাহায্য, খয়রাতি প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও যতটুকু ছিল তথাকথিত আর্থিক সংস্কার আর 'উন্নয়নে'র ঝোড়ো বাতাস তাকে 'ভর্তুকি' অপবাদ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। নির্মম বাজার অর্থনীতির বাজারে তার হাতে চালটুকু কেনার পয়সা নেই। পণ্য আর মুনাফার সর্বগ্রাসী দাপটে দয়া, মায়া, মানবতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। শাসন ক্ষমতায় যারা বসে, তারা মালিকশ্রেণীর দল, তাই কেন্দ্রের বা রাজ্যের শাসকদলের চোখে মালিককে সাহায্য দেওয়ার নাম 'শিল্পায়ন', 'লগ্নীর অনুকূল পরিবেশ' রচনা। আর গরিবের জন্য সস্তায় খাবার, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল 'ভরতুকি'। সেসব আজ প্রায় বিলুপ্ত। তাই অতি সহজেই গরিব মানুষকে আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়াতে হচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জল, জঙ্গলের ওপর মানুষের অধিকার খতম হয়ে চালু হয়েছে মালিকের অধিকার। লোধা, শবর সহ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা জঙ্গলের কাঠ বা পাতা সংগ্রহ, মাছ ধরার অধিকার আজ আর নেই। তাঁদের বংশানুক্রমিক জীবিকাকে পুঁজিবাদী আইন 'চুরি' বলে চিহ্নিত করেছে। এঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, পেশা বদলের উপায় নেই। শাসকরা ফতোয়া দিয়েছে এরা 'ক্রিমিনাল ট্রাইব'। অথচ শোষিত মানুষের মধ্যেও এরা সবচেয়ে বঞ্চিত, শোষিততম। কেউ এদের মৃত্যুর খবরও করে না, তাই তা প্রকাশ্যে আসে না। ঘটনাচক্রে যেটুকু বের হয় তা হিমশৈলের চূড়াটুকু মাত্র।

'৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনের ঠিক আগে, বিধানসভায় প্রায় প্রতিদিন একটি করে অনাহার-মৃত্যুর কথা তুলে সরকারের জবাব দাবি করত বামপন্থীরা। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন বলতেন — অনাহারে নয়, ওরা মারা গিয়েছে হার্ট ফেল করে। ওড়িশার কালাহান্ডিতে অনাহার মৃত্যুর সাফাই দিয়ে ওড়িশা সরকার বলেছে — ওরা না খেয়ে নয়, বুনো আমের কষি খেয়ে মরেছে। কেন তারা বুনো আমের কষি খায়? কেন হার্ট ফেল করে? কেনই বা অপুষ্টি, যক্ষ্মা, জন্ডিসে আক্রান্ত হয়? কারণ অনাহার, যা তিলে তিলে তাকে মৃত্যুর কবলে ঠেলে দেয়।

শুধু আমলাশোলেই নয়, একই ঘটনা ঘটে চলেছে চা-বাগানে, বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক পরিবারে, ফসলের দাম না পাওয়া চাষীর ঘরে, কর্মহীন বেকার বা খেতমজুরের জীবনে। এরা কেউ বিষ খায়, কেউ গলায় দড়ি দেয়। কিন্তু কীসের তাড়নায়? অভাবের তাড়নায়। আসন্ন অনিবার্য অনাহারের হাত থেকে বাঁচার জন্য এরা নিজেকে মারে। সরকার ও শাসকদলের 'উন্নয়নে'র চোখ ঝলসানো প্রচারের সাধ্য কী সেই আর্তনাদকে চাপা দেয়! শহর জুড়ে মহাসড়ক হচ্ছে, চকচকে উড়াল পুল হচ্ছে, গগনচুম্বী বাড়ি হচ্ছে, এয়ারকন্ডিশন্ড মার্কেট হচ্ছে, সরকারি প্রচারে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে ভূমিসংস্কার হচ্ছে, গ্রামীণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে — এই লোকঠকানো মিথ্যা জৌলুষের তলায় গরিবের কান্না চাপা দিতে চাইছে সিপিএম।

তাদের মালিকতোষণ এবং গরিবনিধনের রাজনীতিকে চাপা দেওয়ার জন্য তারা এতদূর মরিয়া যে শাসকদলের নেতা, মন্ত্রী, প্রশাসনের কর্তারা গ্রামের মানুষকে ভয় দেখিয়ে মিথ্যা বলতে বাধ্য করছে, জবরদস্তি বলাতে চেষ্টা করছে তাদের খাদ্যের অভাব নেই। এর থেকে অমানবিকতা আর কী হতে পারে?

কাজের বহির্গমন

নয়া উপনিবেশবাদের আধুনিক রূপ

সঙ্কটজর্জরিত ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী শোষণের জাল অবিচ্ছিন্ন রাখার আধুনিকতম পন্থা বিশ্বায়ন-উদারীকরণ। বিশ্বায়নের এই পরিকল্পনা রূপায়ণের বিবিধ কার্যকরী পন্থাগুলির মধ্যে যেটি আজ সবচেয়ে বেশি আলোচিত, তা হল বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও)। অর্থাৎ, বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার কাজকে সংস্থা-বহির্ভূত ক্ষেত্রের হাতে অর্পণ করা। প্রচারমাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে এমন একটি ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে যে, এটা হল ধনতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির একটা মঙ্গলকর দিক। কারণ এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রচুর কাজের সুযোগ তৈরি হবে। বিশেষ করে ভারতীয়দের সামনে এই সুযোগে নিজেদের ভাগ্য ফেরানোর এক বিশাল প্রত্যাশা সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ যে সব দেশে এই ধরনের কাজ আসার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করা হচ্ছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। যুক্তি হিসাবে বলা হচ্ছে, ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও উৎকর্ষ এই ধরনের কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী।

ভারতে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং-এর বিরুদ্ধে আমেরিকার জনগণ

আগে বড় বড় মার্কিন সংস্থা ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সূক্ষ্ম কাজের জন্য ভারত থেকে দক্ষ প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে আসত। এইভাবে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ থেকে প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে চাকরিতে নিয়োগ করার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আমেরিকার অভ্যন্তরে কিছু কথা উঠতে শুরু করেছিল। কারণ মার্কিন শ্রমিকরা আশঙ্কা করছিলেন যে, এর ফলে তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা হ্রাস পাবে ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর অফিস-কাছারিতে স্থানীয় মানুষের চাকরির সুযোগ কমে যাবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিন শ্রমজীবী মানুষ দেখতে পেলেন যে, আগের মতো অন্য দেশের বিশেষজ্ঞদের আমদানি করার পরিবর্তে বড় বড় মার্কিনি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি এক নতুন কায়দায় ব্যবসা চালাচ্ছে। তারা ইতিমধ্যেই তাদের কর্মীসংখ্যায় বড় রকমের কোপ দিয়েছে ও সেইসব কাজ কম খরচে আউটসোর্সিং-এর জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থার কাছে।

এইভাবে চাকরির একটা বিরাট বাজার বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও এর বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ আন্দোলনও গড়ে তোলার হুমকি দেন। এখন যেহেতু সামনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, তাই কর্মী সংকোচনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর। পরিস্থিতি সামাল দিতে বুশ প্রশাসন তাই একটা চালাকির আশ্রয় নেয়। মার্কিন সিনেটে ৩২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার ব্যয়বরাদ্দ করে একটা বিল পাশ করানো হয়, যার কিছু অংশ দেখলে মনে হবে, এটা ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলির স্বার্থবিরোধী। এতে বলা হয়, 'ম্যানেজমেন্ট' এবং 'বাজেট সার্কুলার এ-৭৬' দপ্তরের যেসব প্রশাসনিক কাজ ঠিকা চুক্তিতে করানো হয়, তার মধ্যে যেগুলি অতীতে মার্কিন ভূখণ্ডের বাইরে মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা করানো হয়েছে সেগুলি বাদে বাকি কাজ মার্কিন ভূখণ্ডের বাইরে ঠিকা দিয়ে করানো যাবে না।''

প্রাথমিকভাবে এ থেকে মনে হতে পারে, যেন মার্কিন সরকার সাধারণভাবে ভারতে কাজের আউটসোর্সিং-এর বিরুদ্ধে। কিন্তু বাস্তবে উপরোক্ত আইনি বিধিনিষেধ শুধুমাত্র সরকারি দপ্তর থেকে ঠিকা দেওয়া কাজগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বেসরকারি উদ্যোগের কাজ আউটসোর্সিং-এর উপর এই আইনের কোনো প্রভাবই নেই। বুশ প্রশাসনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, গ্রেগরী ম্যাক্সভিউ পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন যে, মার্কিন কোম্পানিগুলির কাছে আউটসোর্সিং হল ''আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এক নতুন রূপ মাত্র'' এবং মনে হয় এটা ''দীর্ঘমেয়াদী বিচারে মার্কিন অর্থনীতির পক্ষে লাভজনকই''। ফলে এটা পরিষ্কার যে, মার্কিন শাসকরা কাজ আউটসোর্সিং-এর পরিকল্পনা বাতিল করেনি, এমনকি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার কোন ব্যবস্থাও করেনি। শুধু নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার আগে পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান জনবিক্ষোভকে তারা খানিকটা প্রশমিত করার চেষ্টা করেছে মাত্র।

বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং কী?

কিন্তু এ ব্যাপারে আরও এগোনোর আগে, আমাদের ধারণা খানিকটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার যে, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বিষয়টা আসলে কী, কী তার বৈশিষ্ট্য ও কেন মার্কিন শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে এত সরব। নির্দিষ্ট কতকগুলো কাজকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার স্থায়ী কর্মচারীদের বাইরে অন্যদের দ্বারা চুক্তির ভিত্তিতে করিয়ে নেওয়াকেই আউটসোর্সিং বলা হয়। অন্য কথায়, এর মাধ্যমে মালিকশ্রেণী, বড় বড় বাণিজ্যিক সংস্থা ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলি উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে এমন দায়ভার ঝেড়ে ফেলতে পারে যা তাদের মতে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। ফলে তারা অনেক কম খরচে করিয়ে নেওয়ার জন্য এইসব কাজ বিভিন্ন বেসরকারি ঠিকাদারী সংস্থার হাতে তুলে দেয়। মূল উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে এইসব কাজগুলিকে আলাদা করে দেখাবার জন্য তারা এর নাম দিয়েছে 'পেরিফেরাল জবস' বা আনুষঙ্গিক কাজকর্ম। তাদের যুক্তি হল, এই ধরনের ব্যবস্থা সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে জটিলতা থেকে মুক্ত করে সহজ করে তোলে এবং 'অনাবশ্যক' কর্মী (অর্থাৎ কর্মরত শ্রমিকদের একাংশ) হ্রাস করে উৎপাদনের সময় ও খরচ কমিয়ে আনে। সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার ফলে যে সব ঠিকাদারী সংস্থা এই ধরনের প্রান্তিক কাজগুলি সামলানোর দায়িত্বে নিযুক্ত হয়, তারাও এই ক্ষেত্রে ক্রমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে ও তাদের ব্যবসার আকারের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট পয়সা কামাতে সক্ষম হয়। ক্রমে ক্রমে শুধু মূল উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয় এমন সব কাজ ছাড়াও, বহু সাধারণ কাজ যেমন হিসাব রক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা রক্ষা ইত্যাদিকেও আউটসোর্সিং-এর আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। **যেটা মালিকশ্রেণী প্রাণপণে গোপন রাখতে চেষ্টা করছে সেটা হল এই যে, এই ধরনের প্রান্তিক কাজগুলি দেশের বাইরের সংস্থাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়ার পিছনে অভাবী মানুষের প্রতি দরদ, কোন মহৎ প্রেরণা, বা কোনো জনমুখী চিন্তাধারা নেই। এর পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা কামানো।** অর্থাৎ শ্রমিকের ওপর শোষণের মাত্রা ক্রমাগত তীব্র করে উৎপাদন খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে এনে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সঙ্কট যত বাড়তে থাকে ততই সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমে যাওয়ার ফলে বাজারও দ্রুত সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং সেই সঙ্কুচিত বাজারের দখল নেওয়ার জন্য পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ক্রমাগত আরও তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। ফলে পুঁজিপতিশ্রেণীর কাছে উৎপাদন খরচ কমাবার চাহিদা আরও বেশি করে দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে মালিকশ্রেণী দেখে যে, সংগঠিত ক্ষেত্রে নিজস্ব স্থায়ী শ্রমিকদের দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেওয়ার বদলে বাইরে থেকে কম পয়সায় চুক্তিতে করিয়ে নিতে পারলে তা অনেক বেশি লাভজনক। কারণ দীর্ঘদিনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা যে অধিকার অর্জন করেছে তদনুযায়ী স্থায়ী কর্মীদের একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট বেতন ও সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত আরও অন্যান্য সুযোগসুবিধা মালিকদের দিতেই হয়। তাই আজ মালিকশ্রেণীর লক্ষ্য হল, এই ধরনের সমস্ত কাজকে ধীরে ধীরে সংগঠিত ক্ষেত্রের বাইরে চালান করা ও স্থায়ী কর্মীদের চাকরি এবং প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ উভয় দিক থেকেই বঞ্চিত করা। এইভাবে একদিকে সংগঠিত ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ কাজের অভাবের অজুহাত দেখিয়ে তারা কর্মীসংকোচন ঘটাচ্ছে ও অন্যদিকে তলে তলে নিঃশব্দে এইসব কাজ বাইরের ঠিকাদারী সংস্থা দিয়ে চুক্তির ভিত্তিতে করিয়ে নিয়ে অধিক মুনাফা করছে। এইসব ঠিকাদারী সংস্থা আবার দেশে তীব্র বেকারি ও কর্মহীনতার সুযোগ নিয়ে আরও কম বেতনে চুক্তির ভিত্তিতে লোক ভাড়া করে, তাদের দিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়ে নেয়। ফলে ঠিকাদারী সংস্থাগুলি চাকরির নিরাপত্তা সহ সমস্ত আইনি সুযোগসুবিধা থেকে শ্রমিকদের আরও বেশি বঞ্চিত করে। এইভাবে উৎপাদন খরচ কমিয়ে অধিক মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে সংগঠিত ক্ষেত্র থেকে ক্রমাগত অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ চালান করার মধ্য দিয়ে সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রের শ্রমিকদের অধিক মাত্রায় বঞ্চনা ও শোষণ করা হয়। এরই নাম হল আউটসোর্সিং।

কিন্তু এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ আরও গভীর সংকটে ডুবতে থাকে। কারণ এই প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতি মালিকরা প্রতিযোগিতায় অন্যদের পিছনে ফেলে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য উৎপাদন খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে এবং চাকরির ক্ষেত্রকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করে চলে। এতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত আরও হ্রাস পেতে থাকে এবং বাজার ক্রমাগত আরও সঙ্কুচিত হতে থাকে। ফলে সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসা দূরের কথা, পুঁজিবাদ ক্রমাগত তীব্র থেকে আরও তীব্র সঙ্কটে নিমজ্জিত হতে থাকে। পুঁজিপতিরা যত টোটকা তাবিজের খোঁজ করুক না কেন এই সার্বিক সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তির কোন রাস্তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় খোলা নেই।

অফশোরিং — আউটসোর্সিং-এর বিশ্বায়ন

এতদিন পর্যন্ত বিজনেস আউটসোর্সিং ব্যাপারটা দেশের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্বায়নের সাথে সাথে, এই আউটসোর্সিং বিশ্বব্যাপী দুটি তীব্র স্রোত তৈরি করেছে — একদিকে দেশের অভ্যন্তরে কাজ ও পরিষেবার কাজ আউটসোর্সিং ও অপরদিকে পণ্য উৎপাদন ও পরিষেবা উভয়কেই ভিন্‌দেশে আউটসোর্সিং বা অফশোরিং। যখন বাইরে থেকে করানো যায় এমন কাজের আউটসোর্সিং, অর্থাৎ পণ্যের পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন বা এসেম্বলি লাইনে যন্ত্রাংশ তৈরি বা জোড়ার কাজ এবং পরিষেবা সংক্রান্ত নানা কাজ দেশের বাইরে অন্য কোথাও চুক্তির ভিত্তিতে সস্তায় করিয়ে নেওয়া হয়, তখন তাকে বলে অফশোরিং। লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, ''পুঁজি রপ্তানি — সাম্রাজ্যবাদের একটি অন্যতম সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য — তা সুদখোর পুঁজিকে উৎপাদন থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে — এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বা উপনিবেশগুলিকে শোষণ করার উপর নির্ভরশীল নিজের গোটা দেশের উপর, পরজীবী ছাপ মেরে দেয়।'' অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যায় এটা পরিষ্কার যে, অফশোরিং-এর এইসব বৈশিষ্ট্য নয়া ঔপনিবেশিক শোষণেরই আধুনিকতম রূপ।

আমেরিকা ছেড়ে কাজের বিদেশে স্থানান্তরকরণ

এই পরিস্থিতিতে আমাদের বুঝতে হবে যে, কেন আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষ ভারতবর্ষে কাজের আউটসোর্সিং-এর বিরুদ্ধে এত সরব। তাদের প্রতিবাদ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ১৯৯৬ সালে গ্যাটের উরুগুয়ে বৈঠকের পরপরই 'নাফ্‌টা'য় (নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট) সই-এর মাধ্যমে মার্কিন কোম্পানিগুলি মেক্সিকোতে হাজার হাজার কাজের অফশোরিং শুরু করে। অন্যান্য সুযোগসুবিধা বা ক্ষতিপূরণ কিছুই না দিয়ে মেক্সিকান কর্মীদের ঘণ্টায় স্রেফ এক থেকে দেড় ডলার মজুরি দিয়ে মার্কিন নিয়োগকর্তারা যে কাজ করিয়ে নিত, সেই একই কাজ একজন মার্কিন শ্রমিককে দিয়ে করাতে হলে তাদের দিতে হত ঘণ্টা পিছু ১৫ থেকে ২০ ডলার মজুরি এবং স্বাস্থ্য-সুরক্ষা এবং পেনশন সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা। ফলে লক্ষ লক্ষ মার্কিন ম্যানুফ্যাকচারিং শ্রমিক, অর্থাৎ কল-কারখানার শ্রমিকরা কাজ হারান। গত তিন বছরে দেখা গেছে যে, উৎপাদন ক্ষেত্রের মোট কাজের অন্তত ১৫ শতাংশ আমেরিকার বাইরে চালান করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিকে কাজের এই ক্রমাগত বিদেশ চালান মার্কিন শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। কারণ শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের হাতে থাকা প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে এই গোটা পরিকল্পনার আসল রূপটা মার্কিন মেহনতি মানুষের থেকে আড়ালে রাখতে সাময়িকভাবে সমর্থ হয়। তারা প্রচার করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল এমন একটি দেশ, যেখানে সর্বদা আরও দক্ষ ও যোগ্যতর শ্রমিকের নিত্যনতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়। কল-কারখানার এইসব কাজের বিদেশে চালান বাস্তবে এইরকম এক নতুনতর কাজ সৃষ্টির সূচনামাত্র, যার ফলে প্রচলিত প্রযুক্তির সাহায্যে বনেদী শিল্পসংস্থার কর্মসম্পাদনের যে রীতি (ব্লু কলার জব), তার পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাজাত অভিজাত কর্মরীতির (হোয়াইট কলার জব) সূচনা হবে। সাধারণ শ্রমিকের বদলে দক্ষ

চারের পাতায় দেখুন

বিপিও-র মাধ্যমে বিপুল চাকরির মিথ্যা স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে

তিনের পাতার পর

প্রফেশনালদের সুযোগ বাড়বে। যখন প্রথম দফায় স্বল্প মজুরির বিভিন্ন কাজ, যেমন বস্ত্রশিল্পের বা চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত নানা কাজ, যা উৎপাদন ক্ষেত্রের এক বিরাট অংশ অধিকার করে আছে — বিদেশে রফতানি হয়ে গেল, তখন ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের বলা হল যে, তারা যেকোন সময়ে সামান্য প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও উচ্চ আয়ের নানা অভিজাত কাজে নিযুক্ত হতে পারে — যেমন মোটরগাড়ি শিল্প বা কনস্ট্রাকশনের কাজ বা সরকারি চাকরি।

এইভাবে মার্কিন নাগরিকদের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, তাঁদের সন্তানদের জন্য অত্যুন্নত ডিজিট্যাল প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানের সমাহারে গড়া এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু এই মিথ্যার ফানুস চুপসে যেতে বেশি দিন সময় লাগেনি। কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিন শ্রমিকরা দেখতে পেলেন যে, শুধুমাত্র কম মজুরির কারখানা-মিস্ত্রির কাজ নয়, রীতিমত উচ্চ মজুরির সায়েবসুবোর বা অফিসবাবুর কাজও অফশোরিং-এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ছে। একটি বড় অর্থনীতিবিষয়ক পত্রিকা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, অবিলম্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চাকরি অফশোরিং-এর ফলে বাইরে চলে যাবে। অন্ততপক্ষে ৩৩ লক্ষ উচ্চ আয়ের কাজ বিভিন্ন পশ্চাদ্‌পদ কম-মজুরির দেশগুলিতে স্থানান্তরিত হবে। অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে আমেরিকায় বেকারির হার ইতিমধ্যেই ১০ শতাংশে পৌঁছেছে। একটানা ৪৩ মাস ধরে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমাগত কর্মী ছাঁটাই হয়ে চলেছে। এও বলা হচ্ছে, ১৯৩০-এর 'মহামন্দার' পর চাকরির ক্ষেত্রে এতবড় দুঃসময় আমেরিকায় আর আসেনি। (তথ্যসূত্র ঃ হাক গুটম্যানের প্রবন্ধ, দ্য স্টেটসম্যান ২৩-৩-০৪)

এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি মার্কিন নাগরিকদের জোরালো ধাক্কা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘‘অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ৩০ বছর ধরে প্রকৃত মজুরি বাড়ছে না, এবং মধ্যবিত্তের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। সাধারণত তিন ভাবে একটি আমেরিকান পরিবার নিজেদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে চেষ্টা করে। প্রথমত আরও বেশি সময় কাজ করে। আমেরিকার মানুষকে এখন সমস্ত শিল্পোন্নত দেশের মানুষের চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে হয়, এমনকি জাপানের থেকেও। দ্বিতীয়ত শুধুমাত্র গৃহকর্তা নয়, পরিবারের সমস্ত সাবালক সদস্যকেই কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। এবং তৃতীয়ত খরচ কমাতে ক্রমাগত বেশি দামের বদলে স্বল্প দামের জিনিসের ব্যবহার বাড়াতে হয়। ফলে বিশ্বায়নের প্রকৃত সুফল পৌঁছেছে শুধুমাত্র সেই সমস্ত আমেরিকাবাসীর কাছে, যাঁরা বহুজাতিক সংস্থা বা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির মালিক বা পরিচালক। কিন্তু বেশিরভাগ আমেরিকান পরিবারের জীবনযাত্রার মান ও অর্থনৈতিক অবস্থা এর ফলে হয়েছে নিম্নমুখী।’’ (দ্য স্টেটসম্যান, ২৫-৩-০৪)। সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আজ সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে। যদি এই অফশোরিং-এর প্রবণতাকে রোধ না করা যায়, তবে চাকরি ক্রমাগত আরও হ্রাস পাবে ও মার্কিন শ্রমজীবী মানুষকেও পৃথিবীব্যাপী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ক্রমাগত মজুরি হ্রাসের প্রবণতার শিকার হয়ে স্বল্প আয়ে জীবন কাটাতে হবে; নতুবা তাঁদের সমস্ত রকম ভর্তুকি হ্রাস মেনে নিতে হবে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হল সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ যখন এইরূপ দু'মুখো আক্রমণের মুখে, ঠিক তখনই মৃত্যু ও ধ্বংসের নায়ক মার্কিন শাসকরা সাধারণ মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনে নেমে আসা অন্ধকারকে গভীরতম করার সুচতুর পরিকল্পনা রচনা করেছে। তাঁদের কাজের সুযোগ কেড়ে নিয়ে সেই কাজ নিঃশব্দে আরও বেশি বেশি করে বিদেশে চালান করে দিচ্ছে। এই হল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের নির্মম কুৎসিত চেহারা। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের দালালরা দিনরাত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গাল পেড়ে চলে ও দাবি করে যে, পুঁজিবাদই সাধারণ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত শ্রেষ্ঠ সমাজব্যবস্থা। অথচ নিজের দেশের মানুষের প্রতিও ন্যূনতম দায়িত্ব পালনের দায় এই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারকবাহকদের নেই। বড় বড় মার্কিন ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের পিছনে শ্রেণীশাসন বজায় রাখার স্বার্থে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করে। ফলে বেশিরভাগ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিই জনস্বার্থের বদলে নানারকম প্রতারণামূলক নীতির আড়ালে কর্পোরেট দুনিয়ার স্বার্থ দেখে থাকেন ও তাদের সর্বাধিক মুনাফা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট

যখন এই ধরনের অন্ধকার মার্কিন সাধারণ নাগরিক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনে নেমে আসছে, তখন কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা ভয়ঙ্কর বেকারি ও প্রচণ্ড দারিদ্র্যপীড়িত ভারতবর্ষের জনসাধারণকে নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তারা বলছে, যেহেতু ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষায় দখল আছে এবং তাদের ম্যানেজমেন্ট ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাও প্রশংসনীয়, ফলে আউটসোর্সিং-এর সবচেয়ে বেশি ফয়দা তারাই তুলতে পারবে। সেইজন্যই বিদেশে আউটসোর্সিং করা সমস্ত কাজেরই অন্যতম গন্তব্যস্থল হচ্ছে ভারতবর্ষ। তার ওপর ভারতীয় কর্মচারীদের মজুরি মার্কিন কর্মচারীদের তুলনায় অনেক কম। একজন মার্কিন সফ্‌টওয়ার ইঞ্জিনিয়ারের মাইনে যেখানে গড়ে বছরে ৬৬,১০০ ডলার, সেখানে একজন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারকে বছরে মাত্র ১০০০ ডলার দিলেই চলে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে হিসেবটা হল, বছরে ৫৫,০০০ ডলার আমেরিকায়, ৫,৯০০ ডলার ভারতবর্ষে; তথ্যপ্রযুক্তি ম্যানেজারদের ক্ষেত্রে আমেরিকায় বছরে ৫৫,০০০ ডলার, ভারতে ৮,৫০০ ডলার; হিসাবরক্ষকদের ক্ষেত্রে আমেরিকায় বছরে ৪১,০০০ ডলার, ভারতে ৫,০০০ ডলার (ঐ)। 'বিজনেস উইক' পত্রিকার একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ‘‘২০০৮ সাল নাগাদ ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ও অন্যান্য পরিষেবা শিল্প থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৭০০ কোটি ডলার। এইসব শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা হবে ৪০ লক্ষ ও তা থেকে আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ভারতবর্ষের সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি'র ৭ শতাংশ।’’ এর ফলে মজুরি হিসাবে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশে আসবে তাতে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে ও ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বড় অংশও সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি আয় করতে পারবে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাবে। তাদের চাহিদা বাড়বে। সেই চাহিদা মেটাতে তারা আরও বেশি টাকা খরচ করবে, ফলে উৎপাদন বাড়বে। এর বহুমুখী প্রভাবের ফলে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।

বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং-এর গন্তব্য দেশগুলির তথাকথিত সুবিধা

বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিংকে কেন্দ্র করে যে লম্ফঝম্ফ শুরু হয়েছে তার পেছনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আরও আলোচনার আগে, আমাদের একবার দেখা দরকার যে, এর আগে যেসব দেশ এই আউটসোর্সিং-এর গন্তব্যস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, বর্তমানে তাদের অবস্থা কী বা এর ফলে সেখানকার জনসাধারণের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেছে কী না। আমরা আগেই দেখেছি যে, উৎপাদন ক্ষেত্রের কাজ আমেরিকা থেকে প্রথম অফশোরিং করা হয় মেক্সিকোতে। কিন্তু মার্কিন কোম্পানিগুলি কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করে যে, একজন মেক্সিকান শ্রমিকের ঘণ্টা-পিছু ১ ডলার মজুরি চীনের শ্রমিকের মজুরির তুলনায় অনেক বেশি। ঐ একই কাজ ৫ ভাগের ১ ভাগ মজুরিতে চীনা শ্রমিকদের দিয়ে করানো সম্ভব। ফলে সমস্ত আউটসোর্সিং মেক্সিকো ছেড়ে চীনের দিকে পাড়ি দেয়। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে চীনের শোধনবাদী নেতৃত্ব ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালানোর ফলে চীনে তখন উৎপাদন শিল্পে মন্দা দেখা দিয়েছে। ১৯৯৫-২০০২ সালের মধ্যে চীনে ঐ শিল্পে প্রায় ১৫ শতাংশ কর্মী হ্রাস হয়েছে। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালের মধ্যেই বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ চীনা শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। ঠিক এই কারণেই চীন হয়ে উঠল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও কয়েকটি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে কাজ চালানের মূল গন্তব্যস্থল।

ইতিমধ্যে চীনে একটি নতুন বিত্তশালী মালিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, যারা ঠিকাদারী সংস্থা পরিচালনা করে, এবং অতি অল্প মজুরিতে শ্রমিকদের নিংড়ে নেয়। এরাই বহুজাতিক বড় সংস্থাগুলির আউটসোর্সিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় সস্তা শ্রমিক জোগান দেয়। এই হল চীনা শ্রমিকদের হাতে ‘‘বাড়তি দু'পয়সা রোজগারের’’ নেপথ্য কাহিনী। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী ‘‘বিশাল সংখ্যক চীনা শ্রমিক আজ স্রেফ না মরে বেঁচে থাকার মতো মজুরিতে কাজ করে। তাদের প্রায়শই কারখানায় তালাবন্ধ করে রাখা হয়, যাতে তারা সুদীর্ঘ সময় ধরে কঠিন ও ভারী কাজ করে যেতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। কারণ মহিলা শ্রমিকরা বেশি ধৈর্যশীল হওয়ায় তাদের দিয়ে জোর করে বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া ও দীর্ঘ সময় ধরে একঘেয়ে কাজ করানো কর্তৃপক্ষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। এরা হল বর্তমানে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে কম মজুরিতে খাটতে বাধ্য হওয়া শ্রমিকদের অন্যতম।’’ (দ্য স্টেটসম্যান, ২৩-৩-০৪)।

আবার সাম্প্রতিককালে যেই দেখা গেল যে, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় জুতো তৈরি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অ্যাসেমব্লিং-এর কাজ প্রভৃতি আরও অনেক কম মজুরিতে করানো সম্ভব, সঙ্গে সঙ্গে মেক্সিকো ও চীন ছেড়ে এই সংক্রান্ত কাজ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আউটসোর্সিং হতে শুরু হয়ে গেল। কারণ একচেটিয়া বড় পুঁজিপতিরা বা বহুজাতিকরা গরিব মানুষের প্রতি ভালবাসা বা দয়াদাক্ষিণ্যের মনোভাব থেকে ব্যবসা করতে নামেনি। গরিব দেশে চাকরি সৃষ্টি তাদের লক্ষ্য নয়। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল, সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা ও সেই লক্ষ্যে শ্রমিকদের মজুরি যতটা সম্ভব কমিয়ে এনে উৎপাদন খরচ নামিয়ে আনা।

ঠিক একইভাবে, প্রায় এক দশক আগে পরিষেবা ক্ষেত্রে আমেরিকা থেকে প্রথম বড় ধরনের অফশোরিং হয় উত্তর আয়ারল্যান্ড অভিমুখে। বিভিন্ন ধরনের অফিসভিত্তিক কাজকর্ম ও কল সেন্টার এইসময় আমেরিকা ছেড়ে উত্তর আয়ারল্যান্ডে পাড়ি দেয়। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন বলা হচ্ছে তেমনভাবেই বলা হয়েছিল, আইরিশরা ইংরেজি বলতে পারে ও সেখানে আমেরিকার থেকে কম খরচে কাজ করানো সম্ভব। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, ঠিক একই কারণগুলির জন্যই ভারতবর্ষকে আরও অধিক লাভজনক বলে দেখানো হচ্ছে। প্রথম দফায় যেসব কাজ আমেরিকা থেকে ভারতে আসছে, দেখা যাচ্ছে, সেগুলি বেশিরভাগই হয় পরিষেবা ক্ষেত্রের স্বল্প আয়ের কাজ, যেমন কল সেন্টারে বসে বিভিন্ন কলের উত্তর দেওয়া ইত্যাদি। কিংবা তার থেকে সামান্য বেশি আয়ের প্রফেশনাল কাজ, যেমন প্রাযুক্তিক পরিষেবা যোগানো বা টেলিফোনে নানা প্রাযুক্তিক পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু বর্তমানে যখন উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সহজেই বিভিন্ন 'কল' বা টেলিফোন মাধ্যমে জানতে চাওয়া প্রশ্ন বা তার উত্তর এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ সম্ভব, তখন এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা 'কলে'র উত্তরের জন্যও ইংরাজি ভাষায় দক্ষতা খুব আবশ্যিক থাকছে না। ফলে, যদি এখন দেখা যায় যে, ইন্দোনেশিয়ায় কল সেন্টারগুলিতে অর্ধেক খরচে কাজ করিয়ে নেওয়া যাচ্ছে, তাহলে ভাষার দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও সমস্ত কাজ ভারত থেকে রাতারাতি ইন্দোনেশিয়ায় পাড়ি জমাবে। ভারতীয় শ্রমিকদের তখন হয় কাজ হারাতে হবে, অথবা আরও কম মজুরিতে ওই কাজ করতে বাধ্য হতে হবে। বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং-এর সুবিধা নিয়ে কথা বলার সময় চাকরির স্থায়িত্ব, ধারাবাহিকতা ও অর্থনৈতিক স্থিতি সকল বিষয়েই চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রাখতে হবে। কারণ আউটসোর্সিং-এর বৈশিষ্ট্যই হল, ক্রমাগত আরও কম মজুরির দেশে সরে যাওয়া, কোথাও স্থির ভাবে বসে থাকা ও কাজ যুগিয়ে যাওয়া নয়।

ভারতবর্ষে নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হওয়ার রঙীন স্বপ্ন

এই প্রেক্ষাপটেই আমেরিকা থেকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের ভারতবর্ষে পাড়ি জমানো ও তার ফলে এদেশে নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনার যে মোহ বিস্তার করানো হচ্ছে তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। মার্কিন চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট টমাস ডোন্‌হাউ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন ডেপুটি চেয়ারম্যান কে সি পন্থের সঙ্গে আলোচনায় মন্তব্য করেন যে, ‘‘ভারতবর্ষের উচিত দেশে দক্ষ শ্রমশক্তির একটি তালিকা তৈরি করা, যাতে মার্কিন সরকার তার প্রয়োজনমাফিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে।’’ বিলগ্নীকরণ, তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রকের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিজেপির অরুণ শৌরি গত ডিসেম্বরে জেনেভায় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পসংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত অন্যান্য পরিষেবা শিল্পের ৮৫ শতাংশই বৈদেশিক চাহিদা মেটাতে কাজ করে চলেছে। এইসব শিল্পে নিযুক্ত মোট কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ এবং এই শিল্পে আহরিত সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৬০০ কোটি ডলার।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী বেছে দিল সি আই এ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাকে 'সার্বভৌমত্ব' হস্তান্তর করতে চায় আগামী ৩০ জুন। সেজন্য ইরাকে একটা সরকার বা কর্তৃপক্ষ চাই। তাই আমেরিকাই একটা অন্তবর্তী সরকার খাড়া করার জন্য তৎপর হয়েছে। জো হুজুর রাষ্ট্রসংঘ তা অনুমোদনও করেছে।

বর্বর আগ্রাসনে ইরাকি জনসাধারণকে পিষে ফেলার পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে, অন্তবর্তী সরকার গঠনে মার্কিন-ব্রিটিশ তৎপরতা দেখেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এর আগে মার্কিন সরকারের হাতের পুতুল হিসাবে যে গভর্নিং কাউন্সিল তৈরি করা হয়েছিল এক বছর ধরে লুণ্ঠন অত্যাচার চালাবার পর এখন অন্তর্বর্তী সরকারের নামে ওয়াশিংটন তারই একটি প্রতিরূপ তৈরি করেছে মাত্র।

গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান হিসাবে মার্কিন দালাল যে নেতার নাম এই সেদিনও ভীষণভাবে প্রচারে এসেছিল, তিনি হলেন আহমদ চালাবি। প্রবাসী এই গাড়ি ব্যবসায়ী ছিলেন মার্কিন সামরিক সদরদপ্তর পেন্টাগনের দালাল। সম্প্রতি পেন্টাগনের সঙ্গে সি আই এ, মার্কিন সামরিক বড়কর্তা এবং প্রশাসনের যে সব লোক ইরাক যুদ্ধে রামস্‌ফেল্ড-উল্‌ফউইট্‌জ গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ — তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ফলে আহমেদ চালাবির পদচ্যুতি ঘটেছে। চালাবির বদলে এখন নতুন অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সামনে আনা হয়েছে আয়াদ আলাউয়িকে। কে এই আলাউয়ি? এ হল সি আই এ এবং ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা M16-এর আস্থাভাজন। আলাউয়ি তার প্রথম বক্তৃতাতেই জানিয়ে দিয়েছে যে, ইরাকিরা দখলদারদের অধীনে থাকতে পছন্দ করে না ঠিকই, তবে "ইরাকের শত্রুদের পরাস্ত করতে আমরা বহুজাতিক শক্তিগুলির সাহায্য নেব। এর জন্য মিত্র শক্তিগুলির সঙ্গে আমরা জোট তৈরি করবো।" এভাবেই ৩০ জুন তারিখে দখলদারির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও মার্কিন বাহিনীকে বাস্তবে আইনসম্মতভাবে দখলদারি কায়েম রাখার ব্যবস্থা করে দিল আলাউয়ি। এখানেই শেষ নয়, বুশ-রামস্‌ফেল্ডের বচন ধার করে সে ইরাকের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের 'ইরাকের শত্রু' আখ্যা দিতেও দ্বিধা করেনি।

আলাউয়ি একসময় ছিল বাথ-পন্থী। ইরাকে ও ব্রিটেনে সে ছাত্রনেতা হিসাবে কাজ করেছে। পরে 'ব্রিটিশ সিকিউরিটি সার্ভিস'-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। এরপর সৌদি আরবের সঙ্গে তার বিভিন্ন যোগাযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে আলাউয়ি ব্যবসায় নামে। তার কথা লিখতে গিয়ে গত ২৯ মে'র 'লন্ডন ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকা লিখছে — "আলাউয়ি মনোমুগ্ধকর কথায় পারদর্শী এবং বুদ্ধিমান; পশ্চিমী গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে মুগ্ধ করার মতো সমস্ত গুণই তার ছিল। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর সি আই এ-র সাহায্যে আলাউয়ি 'ইরাকি ন্যাশনাল অ্যাকর্ড' তৈরি করেছিল।

পত্রিকাটি লিখেছে, আলাউয়ির মারফতেই খবর এসেছিল যে ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে এবং সেগুলি ৪৫ মিনিটের মধ্যে চালু করা যায়। পত্রিকাটি আরো জানাচ্ছে, ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আলাউয়ি ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা M16-এর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা CIA-র ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নতুন কর্তাদের কাছে সে বলেছিল বাগদাদে একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার ক্ষমতা তার আছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার সাহায্যে একটা অভ্যুত্থান ঘটানোও হয় — কিন্তু সেটি ব্যর্থ হয়। এরপর গত বছর বাগদাদ শহর মার্কিন দখলে এসে গেলে আলাউয়ি তার 'ইরাকি ন্যাশনাল অ্যাকর্ড' বা INA স্থাপন করল ইরাকে। জনগণের এতটুকু সমর্থনও তার পক্ষে ছিল না। উত্তর বাগদাদের বৈজি শহরে গত বছর একটি বিদ্রোহ হয়েছিল; সেই ঘটনার পরেই সাধারণ মানুষ INA-এর দপ্তরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

তথাকথিত 'অন্তর্বর্তী সরকার'-এর এমনই দৈন্যদশা যে মার্কিন শাসকশ্রেণী রীতিমত বিষণ্ণ, হতাশ। ২ জুন তারিখের ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা খুব দুঃখ করে লিখেছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের দূত লাখদার ব্রাহিমিকে সার্বভৌম ইরাক গড়ে তোলার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সে কাজে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বহু নিন্দিত ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিল যাদের ভিড়ে ভারাক্রান্ত ছিল — সেইসব পূর্বতন প্রবাসী ও কুর্দিশ রাজনীতিবিদদের নিয়েই তৈরি করা নতুন মন্ত্রীসভাটি ব্রাহিমি বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করেছেন। তবে একই সঙ্গে ব্রাহিমির প্রকৃত সমস্যাটি তুলে না ধরে পারেনি এই পত্রিকাটি। লেখা হয়েছে, "ব্রাহিমির এ'ছাড়া বোধহয় আর কোনও উপায়ও ছিল না। ইরাকে সম্ভবত এমন একজনও জনপ্রিয় নেতা নেই যিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য মার্কিন পরিকল্পনার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম।" এক বছর ধরে নৃশংস আগ্রাসন চালাবার পর মার্কিন সৈন্যরাই শুধু নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেকোনও মানুষ আজ ইরাকিদের চোখে চরম ঘৃণার পাত্র। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন লোক মার্কিন সেনাদের বর্বর হানাদারি, আবু ঘ্রাইব কারাগারের নৃশংস অত্যাচার, ফালুজা কিংবা নাজাফের মতো অসংখ্য শহরে হত্যা ও ধ্বংসলীলা দেখেও এই সাম্রাজ্যবাদী নরপশুদের প্রতি অনুরক্ত, তারাও সাধারণ ইরাকিদের চোখে ঘৃণিত হয়ে পড়ার ভয়ে মার্কিনীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারছে না। কারণ সবাই জানে, সামরিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে সার্বভৌমত্ব হস্তান্তর করার কোন অর্থই হয় না, বিশেষত যখন এই সার্বভৌমত্ব দেওয়া হচ্ছে যাদেরকে — সেই ইরাকি জনসাধারণই সর্বান্তকরণে তাদের ঘৃণা করে।

5.6.04 রেবাড়ী S.U.C.I.
DONT KILL FOR OIL STOP WAR ON IRAQ S.U.C.I.
विरोध प्रदर्शन
5 जून 2004
एस.यू.सी.आई. (S.U.C.I.)

ইরাক ও প্যালেস্টাইনে গণহত্যার প্রতিবাদে ৫ জুন হরিয়ানার বিভিন্ন শহরে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

ইরাককে ঠিক কতখানি সার্বভৌমত্ব দেওয়া যায়, তাই নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দর-কষাকষি করেছে। বিতর্কের বিষয় ছিল — ইরাক থেকে মার্কিন বাহিনীকে সরে যাওয়ার জন্য কোন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে কিনা, মার্কিন সামরিক কার্যকলাপে ইরাকিদের নির্দেশ কতখানি মেনে চলা হবে, ইরাকি সেনাবাহিনী ও পুলিশের ওপর কার নিয়ন্ত্রণ থাকবে, আর্থিক ক্ষেত্রে কী নীতি হবে — ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে বিতর্ক যতই চলুক, ৩০ জুনের পরেও যাতে ইরাকের ওপর নিয়ন্ত্রণ অটুট রাখা যায়, মার্কিন সরকার সে ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। ১৩ মে'র ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল লিখছে, "ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন প্রশাসক পল ব্রেমার এবং অন্যান্য অফিসাররা ব্যবস্থা এমন পাকা করে ফেলেছেন যাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্তকেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।" সরকারের প্রতিটি স্তর এবং প্রতিটি মন্ত্রককে ওয়াশিংটন নিজের উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যবস্থা রেখেছে। যে সমস্ত মার্কিনী কর্তা বা ইরাকি দালালদের উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করা হবে, তারাই ঠিক করবে কন্ট্রাক্টের বরাত কাকে দেওয়া হবে। অনুসন্ধান চালানো এবং সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেবার কাজও এরাই করবে। ফলে মার্কিন অনুমতি ছাড়া এই নতুন সরকার কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এক পা-ও এগোতে পারবে না। ইন্সপেক্টর জেনারেল দপ্তর নতুন সরকারের প্রতিটি মন্ত্রককে পাঁচ বছরের মেয়াদে লোক নিয়োগ করবে।

ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল আরও লিখছে, "ইরাককে মার্কিন সরকারের আওতায় রাখার নতুন মূল কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে নতুন দূতাবাসটি।" এই দূতাবাসে কাজ করবেন ১৩০০ মার্কিন এবং ২০০০-এর বেশি ইরাকি। মার্কিন সামরিক বাহিনীর দুই প্রাক্তন বড়কর্তাকে সহকারী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে ইরাকের নতুন 'প্রো-কনসাল'-এর কাজ করবেন রাষ্ট্রদূত জন নেগ্রোপন্টে। ইরাকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার মার্কিন সেনা থাকবেই, উপরন্তু সেদেশে ১৪টি স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে পেন্টাগন। ইরাকের তৈলখনিগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে ওয়াশিংটন আরো নানাবিধ জটিল ও গোপন কার্যক্রম শুরু করেছে।

এ সমস্ত কিছুই ইরাকি জনসাধারণের জানা। সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের কথা বলে জর্জ বুশ যতই ঢাক পেটান না কেন, আসলে তাদের মূল উদ্দেশ্য যে ইরাককে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দেওয়া — এ কথা ইরাকিরা ভালভাবেই জানে। তাদের এই উপলব্ধিই প্রতিরোধের আগুনে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে এবং এই প্রতিরোধ ক্রমেই আরো বাড়তে থাকবে।

বুশের নির্বাচনী কৌশল হিসাবে গত ডিসেম্বর মাসেই ৩০ জুন ইরাকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল সুখের সময় আগতপ্রায়। ভাবা গিয়েছিল যে তেলের ব্যবসা থেকে পাওয়া বিপুল অর্থ মার্কিন শিল্পপতিদের সিন্দুক ভরিয়ে তুলবে; ইরাকি অর্থনীতিকে মার্কিন বহুজাতিকদের কব্জায় রাখার প্রধান কৌশল হিসাবে তথাকথিত পুনর্গঠন কর্মসূচি রমরম করে চলবে। ভাবা গিয়েছিল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতাকে বিশ্ববাসীর চোখ থেকে আড়াল করতে একটি স্থায়ী পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসানো যাবে; ধনিকশ্রেণীর মনে খুশির তুফান তুলে প্রচুর অর্থ ওয়ালস্ট্রিটের শেয়ার বাজারে ভিড় জমাবে এবং প্রচারমাধ্যমের মুখ বন্ধ করা যাবে। মনে করা হয়েছিল বুশ-রামস্‌ফেল্ডের আগাম আঘাত হানার এবং বিশ্ববিজয়ের তত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহের নিরসন হবে। নির্বাচনে বুশের পক্ষে প্রবলভাবে ভোট পড়বে।

আজকে একথা কারোরই অজানা নয় যে সাধারণের চোখের আড়ালে অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের নামে একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকে খাড়া করা হচ্ছে। মার্কিন 'অকুপেশন অথরিটি গ্রীন জোন'-এর মধ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রাখা হচ্ছে এদের। এই নতুন অন্তর্বর্তী সরকার কোথায় এবং কখন কাজ শুরু করতে চলেছে তা গোপন রাখা সত্ত্বেও ঠিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময়ে ইরাকি প্রতিরোধ বাহিনী গ্রীন জোনের চত্বরে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের লোকজন যখন আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে গ্রীন জোনের কাছেই মধ্য বাগদাদের একটি এলাকায় বোমাবর্ষণ করেছে প্রতিরোধ বাহিনী। চারটে মর্টার বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ঐ এলাকায়। গ্রীন জোনের একটি প্রবেশপথের সামনে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সেনারা সম্মেলন স্থল থেকে বেরিয়ে আল-রাশিদ হোটেলের দিকে ছুটে যায়; মাথার ওপর পাক খেতে থাকে এয়ারক্রাফ্‌ট।

স্বভাবতই পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যম এসব ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনটিতেই শুধু ঐ সরকারের নয়, খোদ মার্কিন দখলদারির দুর্বলতা এবং ইরাকি মানুষের থেকে তার বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ইরাকি জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম বুশ-প্রশাসনকে ফালুজা এবং নাজাফে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পড়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রকাশিত হয়েছে
কমরেড শিবদাস ঘোষের
সিলেক্টেড ওয়ার্কস
প্রথম খন্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ)
প্রাপ্তিস্থান ঃ এস ইউ সি আই অফিস
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী বেছে দিল সি আই এ

পাঁচের পাতার পর

পেন্টাগনও পিছু হটেছে। জর্জ বুশের নির্বাচনী প্রয়োজনের হিসাবটিও মার্কিন বাহিনীর পিছিয়ে আসার পিছনে একটি কারণ হিসাবে কাজ করেছে। একের পর এক মৃত্যু ও দুর্ঘটনার খবরে মার্কিন নাগরিকদের ক্ষোভ ক্রমাগত বাড়ছিল, ইরাক দখল করতে লক্ষ কোটি ডলার ঢালা হচ্ছিল অথচ আশু ফললাভের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। এবং সবশেষে আবু ঘ্রাইবের নৃশংসতা প্রকাশ্যে এসে পড়ায় জর্জ বুশের ভোটের ঝুলি প্রায় ফাঁকা হতে বসেছিল।

ইরাকি জনগণের লাগাতার প্রতিরোধের সামনে পড়ে শাসকশ্রেণী, সামরিক বাহিনী এবং প্রচারমাধ্যমের ঐক্যে চিড় ধরে গেছে। একসময় এরা সকলে একযোগে যুদ্ধের পক্ষে সওয়াল করেছে। কিন্তু দখলদারির মেয়াদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠেছে, মোহভঙ্গ হয়েছে। ফালুজা কিংবা নাজাফের মতো ইরাকের আর কোনো সামরিক বা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা জর্জ বুশের পক্ষে আজ আর সামলানো সম্ভব নয়।

ইরাকি প্রতিরোধের সামনে পড়ে মার্কিন দখলদারির অবস্থা আজ সত্যই করুণ। প্রচারমাধ্যম এবং জিগনিউ ব্রেজেজিনস্কি ও জেনারেল উইলিয়াম ওডোমের মতো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপদেষ্টারা বারবার ইরাক ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়ে চলেছে। শাসক শ্রেণীর একাংশের মধ্যে নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কা দানা বাঁধছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুর্দশা দেখে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন যদি স্তিমিত হয়ে পড়ে, তাহলে কিন্তু ঘোর বিপদ। পেন্টাগণ তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইরাক সহ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর দখল কায়েম রাখার মার্কিন রণনীতি এই মুহূর্তে কিছুটা ঘা খেলেও সাম্রাজ্যবাদ তা পরিত্যাগ করবে না।

ইরাকি জনগণের প্রতিরোধের তীব্রতা, শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার ভাঙন, মার্কিন সেনাবাহিনীর নিঃশেষ হয়ে আসা শক্তি এবং বুশের ঘনিয়ে আসা নির্বাচন ইত্যাদি কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যাতে মার্কিন সরকার ইরাকে তার রণনীতি বদলাতে বাধ্য হয়েছে। এসব দেখে কেউ কেউ আশা করবেন যে, শান্তিপূর্ণ পথে হয়তো এই সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এই সময়ে যখন মার্কিন দখলদারি বেকায়দায় পড়েছে, তখন ‘সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী জর্জ বুশ’ — এই স্লোগান না আউড়ে যে বৃহৎ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তি সারা বিশ্বকে শোষণ করে পদানত করতে চায়, সেই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই বৃহৎ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই হল যাবতীয় যুদ্ধের সৃষ্টিকর্তা এবং এরাই হল আজ প্রকৃত যুদ্ধাপরাধী।

নয়া উপনিবেশবাদের আধুনিক রূপ

চারের পাতার পর

উৎসাহের তলায় শ্রীশৌরি যে কথাটা চাপা দিতে চান তা হল, উৎপাদন ও অন্যান্য শিল্পে মন্দার কারণে ঐ একই সময়ে দেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে, প্রতিদিন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। আর বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং-এর কাজেই বা চাকরির সম্ভাবনা কতটুকু? আন্তর্জাতিক ডাটা কর্পোরেশনের (IDC) হিসাব অনুযায়ী ২০০২-২০০৩ আর্থিক বছরে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিশ্বব্যাপী বিকাশের অর্থমূল্য ৩৪,৯০০ কোটি ডলার। ঐ একই বছরে তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা ক্ষেত্রে ভারতের অংশ মোট বিশ্ববাজারের মাত্র ২.৮ শতাংশ ও উত্তর আমেরিকার বাজারের মাত্র ৩.৯ শতাংশ। ২০০১ সালে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প সংক্রান্ত আউটসোর্সিং-এর ক্ষেত্রে মোট খরচ করা হয়েছিল ৭১,২০০ কোটি ডলার, যার মধ্যে মার্কিন সংস্থাগুলির খরচের পরিমাণ ছিল ৪৫,১০০ কোটি ডলার। কিন্তু তখনও দেখা গেছে, এই সংক্রান্ত আউটসোর্সিং-এর বিশ্ববাজারে ভারতের অংশ মাত্র বর্তমান মাপকাঠিতে ০.৩ শতাংশ (১৬০ কোটি ডলার) ও আমেরিকার বাজারের ০.৫ শতাংশ। বিশ্ববাজারে প্রযুক্তির প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অগ্রগণ্য সংস্থা, ফরেস্টার রিসার্চের মতে আউটসোর্সিং-এর ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারের বিকাশের সম্ভাবনা আর মাত্র ১৪,৮০০ কোটি ডলার, যাও ২০০৮ সাল নাগাদ নিঃশেষিত হয়ে যাবে (ফ্রন্টলাইন, ১৯-১২-২০০৩)। এখন এই প্রেক্ষাপটে ভারত সরকারের এই দাবি কতটা বিশ্বাসযোগ্য যে, আউটসোর্সিং-এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত পরিষেবা শিল্পের বিশ্ববাজারের ৬ শতাংশ ভারতের হাতে আসবে? দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের সামগ্রিক বিকাশের বদলে আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভর করে এই শিল্পে কত চাকরি সৃষ্টি হবে? কর্মচারীদের এক কাজ থেকে অন্য কাজে যোগদান বা প্রচলিত কাজগুলি কম্পিউটার দিয়ে করানো — একেই যদি উন্নয়ন ধরে নিয়ে ভারত সরকার এগোতে চায়, তা হবে আকাশকুসুমের মতোই অলীক।

অপরদিকে, এর ফলে হয়তো মুষ্টিমেয় দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং ঐ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সাধারণের তুলনায় অনেকটা আয়বৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু একইসঙ্গে শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ, দেশের মোট জনসংখ্যার যারা প্রায় ৭৫ শতাংশ, তারা উত্তরোত্তর কর্মহীনতা ও অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের শিকারে পরিণত হবে। ফলে সচ্ছল ও দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক অসাম্য আরও বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যেই সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে ১০ লাখেরও বেশি অফিস পদের বিলোপ ঘটানো হয়েছে। এরকম আরও অসংখ্য পদও বিলুপ্ত হওয়ার মুখে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় কর্পোরেট সংস্থাগুলিও ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব কাজের আউটসোর্সিং-এর পরিকল্পনা নিতে শুরু করেছে। ফলে দেশীয় শিল্প থেকে কাজ বিদেশে যাবে এবং আরও কর্মী সংকোচন ও লে-অফের সম্ভাবনা আরও প্রকট হবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশঙ্কার বিষয় হল, আউটসোর্সিং-এর এই মাত্রাধিক্যের কারণে এদেশে কাজের চরিত্র বদলে যাবে। অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময়ের কাজ, ঠিকা কাজ বা অস্থায়ী কাজ, এইসবগুলিই হয়ে উঠবে কাজের সীমিত বাজারের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। চাকরির ক্ষেত্রে কোনোরকম স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা বা সেই মর্মে কোনোরকম আইনি সুরক্ষাই আর থাকবে না। স্বাস্থ্য ও পেনশন সংক্রান্ত যেটুকু সুযোগ সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা আজও ভোগ করেন তারও বিলোপ ঘটবে। কারণ, স্থায়ী চাকরি বলেই ভবিষ্যতে আর কিছু থাকবে না। স্বভাবতই সাধারণ শ্রমিকের জীবনে আরও চরম দুর্দশা নেমে আসবে, তা সে আমেরিকা বা ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর আর যে কোনো দেশেরই শ্রমিক হোক না কেন।

অফশোরিং — শোভন মুখোসের আড়ালে নির্মম শ্রমিক শোষণ

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, অফশোরিং হল আউটসোর্সিংয়েরই উন্নত ধাপ, যা শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থেরই পরিপূরক; পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে অপর দেশের সস্তা শ্রমশক্তি লুণ্ঠনের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তেরই অঙ্গ, নয়া ঔপনিবেশিকতার আধুনিক রূপভেদ। তথ্যপ্রযুক্তি বা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্পের প্রসারের ফলে শ্রমিকদের একটি অংশের মধ্যে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও বৌদ্ধিক অগ্রগতি ঘটলেও, পুঁজিবাদী সমাজে সমস্ত শ্রমশক্তিই আগেও যেমন পণ্য ছিল, এখনও তাই-ই আছে। অপর দেশে সস্তা শ্রমশক্তি খুঁজে নিয়ে, তাদের দিয়ে উৎপাদনের কাজ করিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এনে দিয়েছে বিশ্বায়ন। ফলে আউটসোর্সিং আজ দেশের বেড়া টপকে অফশোরিং-এর নামে আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করেছে, যা কাজের রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক উভয় দেশের সমাজেই অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়াচ্ছে। সস্তা শ্রমের খোঁজে এক দেশ থেকে কাজ অন্য দেশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে চাকরিক্ষেত্রে প্রবল নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর ফলে ‘উন্নত’ দেশ থেকে ‘উন্নয়নশীল’ দেশে পুঁজির রপ্তানি মারফৎ উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্পদ স্ফীত হচ্ছে। কিন্তু হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। কারণ, এজন্য নেওয়া ঋণের উপর মোট সুদের পরিমাণ, উভয়পক্ষের মোট মুনাফা, প্রযুক্তিগত খরচ প্রভৃতি সবকিছু ধরে হিসাবনিকাশের পর দেখা যাচ্ছে যে, আউটসোর্সিং-এর ফলে যত পুঁজি উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ হচ্ছে, মুনাফার আকারে উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ফিরে যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য গরিব দেশগুলিতে কম মজুরির কাজে নিযুক্ত মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন নয়, বরং নিজেদের সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা এবং তার জন্য বেপরোয়াভাবে শ্রমিক শোষণ করা।

অবশ্য, একজন মার্ক্সবাদীর কাছে এটা অজানা বা নতুন কিছু নয়। কারণ মার্ক্সবাদ তাঁকে দেখিয়েছে, সমাজবিকাশের ঐতিহাসিক ধারা এবং তার গতিমুখ কোন্ দিকে। কার্ল মার্ক্স তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ ক্যাপিটাল-এ দেখিয়েছেন, ‘‘পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের বিকাশের সমস্ত উপায়গুলিই উৎপাদকদের শোষণ ও দমনের হাতিয়ারে পরিণত হয়। উৎপাদন বিকাশের সমস্ত উপায়গুলি মানুষের শ্রমকে নিছক মানবদেহের একটা ক্রিয়ার স্তরে টেনে নামায়, তাকে নিছক যন্ত্রের লেজুড়ে পরিণত করে, শ্রমের আনন্দের শেষ বিন্দুটুকুও শুষে নিয়ে শ্রমকে অবাঞ্ছিত খাটুনিতে পরিণত করে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিজ্ঞানের যে বৌদ্ধিক শক্তি নিহিত থাকে, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের বিকাশ, শ্রমের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের সেই বৌদ্ধিক বিকাশের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে, ... এ থেকেই বোঝা যায়, পুঁজি যত পুঞ্জীভূত হয়, শ্রমিকের বেতন বেশিই হোক আর কমই হোক — তার ভবিষ্যত ক্রমেই আরও অন্ধকারময় হয়।’’

পুঁজিবাদের বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে এ যুগের অগ্রগণ্য মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন — ‘‘সঙ্কটজর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বাজারের... একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল, ‘‘পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটা বিকাশ ঘটাবার অবসর তখনও ছিল। এবার পুঁজিবাদের তৃতীয় বিশ্বজোড়া বাজার-সঙ্কটের যুগে তাও চলে গিয়েছে। পুঁজিবাদের এখনকার সঙ্কট হচ্ছে এবেলা-ওবেলার সঙ্কট।’’ (২৪ এপ্রিল ১৯৭৪-এ প্রদত্ত ভাষণ থেকে)

মার্ক্সবাদী চিন্তানায়করা এও দেখিয়েছেন — আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদ পুরনো কায়দায় পরদেশ দখল না করেও এবং সরাসরি সে দেশ শাসন না করেও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠন চালায়। এটাই হল নয়া-উপনিবেশবাদ। তীব্র সঙ্কট থেকে বাঁচার মরিয়া চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদ পুঁজি রপ্তানির দ্বারা নতুন নতুন কায়দায় আরও নির্মম শোষণ চালাবার জন্য নিত্যনতুন পন্থা উদ্ভাবন করছে। ‘বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং’ বা বিপিও এমনই একটি নতুন কৌশল।

সাম্রাজ্যবাদের এই নতুন আক্রমণের মুখে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে হবে, পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গিয়েছে, আজ বাঁচার মরণপণ চেষ্টায় সে চাইছে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করে রাখতে, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মত উন্নত ও উন্নয়নশীল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের কাঁটা পুঁতে দিতে। মার্কিন একচেটিয়া মালিকশ্রেণী মার্কিন শ্রমিকদের বোঝাতে চাইছে ভারতীয় শ্রমিকরা চাকরি খেয়ে নিচ্ছে বলেই তাদের বেকারি বাড়ছে। কিছু কিছু রাজ্যে ঝানু মার্কিন রাজনৈতিক নেতারা বিপিও-র বিরুদ্ধে আইন করার হুমকি পর্যন্ত দিয়ে শ্রমিকদরদী সাজছে। অন্যদিকে ভারতে ‘বাম’ বা ‘দক্ষিণ’ তথাকথিত উন্নয়নের ধ্বজাধারীরা বিপিওর মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অলীক বিকাশ ও বিপুল সংখ্যক চাকরির রঙিন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম নেতারাও এই সুরে সুর মিলিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির জন্য যাবতীয় সরকারি সাহায্য দিচ্ছে তাই নয়, এই শিল্পকে অত্যাবশ্যক শিল্পের আওতায় এনে এই ক্ষেত্রকে আন্দোলন, বন্‌ধ-এর আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, মার্কিন শ্রমিকদের বেকারির কারণ ভারতীয় শ্রমিক নয়, তাদের বেকারির কারণ হল পুঁজিবাদ; মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদী শোষণ। ভারতীয় শ্রমিককে বুঝতে হবে, বিদেশ থেকে পুঁজি বা চাকরি এসে তার দুর্দশা ঘোচাবে না। এ পথে যে মোক্ষলাভের ধোঁকা তাকে দিচ্ছে মালিকশ্রেণীর উচ্ছিষ্টভোজী রাজনৈতিক নেতারা — তাদের স্বরূপ বুঝতে হবে। পুঁজিবাদের আওতায় ‘উন্নয়নের’ মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তাকে বুঝতে হবে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ ছাড়া শ্রমিকের মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক আক্রমণের এই চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে এগিয়ে আসতে হবে। নিজ নিজ দেশে তাদের শক্তিশালী পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যার অন্যতম লক্ষ্য হবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্যকে অটুট রেখে ও আরও সংহত করে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিংয়ের মতো শ্রমিকস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ও সেগুলিকে রুখে দেওয়া। একমাত্র আন্দোলনের চাপেই তারা তাদের জীবনজীবিকার উপর সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, চাকরির নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

ভোটের পরেও জনপ্রিয়তার প্রিয় উৎস সেই গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন

বহরমপুর, মালদহ ও মুর্শিদাবাদে নির্বাচনে বাজিমাত করার অন্যতম ইস্যু গঙ্গা-ভাঙন। বিগত লোকসভা নির্বাচনের মতই অন্যান্য নির্বাচনগুলিতেও গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন রোধে মাস্টার প্ল্যান করে তা কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কার্যকরী না করে জল সম্পদ দপ্তরের ঠাণ্ডা ঘরে বসে সময়কাল পার করেননি, কেন্দ্র-রাজ্যে এমন মন্ত্রী নেই বললেই চলে। সম্প্রতি মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জনের দৌড়ঝাঁপে সেই চিত্রটিই ভাঙন-বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠছে। বাস্তবিক ভোটের আগে বা পরে এ জেলায় জন মনোরঞ্জনের এমন প্রিয় উৎস তো আর নেই! মুর্শিদাবাদ জেলাতেই অস্বাভাবিক ও বিধ্বংসী ভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষ শুধু বর্ষার জলে বোল্ডার ফেলে সরকারি টাকা নয়ছয় আটকাতে, শুখা মরশুমে পাড় বাঁধাই-এর দাবি তুলে আন্দোলন করতে গিয়ে ভগবানগোলা আখরীগঞ্জে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন নহীরুদ্দিন সেখ। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রক হাতে পাবার পর মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মুখে গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন রোধে আবারও নানা বিবৃতি প্রকাশ শুরু হয়েছে। অথচ সরকারি হিসেবে শুধু মুর্শিদাবাদেই ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ৩৫,৭৮৯ হেক্টর। অর্থমূল্যে এর পরিমাণ কত দাঁড়ায়? শুধু ২০০০ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ভাঙনে সর্বস্ব খোয়ানো মানুষের সংখ্যা ৫৫৫০ জন (২০০০ সালে ২৫০০ জন, ২০০১-এ ১১০০ জন, ২০০২-এ ৭৫০ জন, ২০০৩-এ ১২০০ জন)।

এই শুখা মরশুমেও ভাঙন অব্যাহত। অথচ ২০০০-এ এক শহীদের আত্মদান, জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আইন অমান্য, কারাবরণের মত দুর্বার আন্দোলনের চাপে জেলা শাসকের পৌরোহিত্যে রাজ্য সরকার শুখা মরশুমে ভাঙন মেরামতির কাজ অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করলেও সেই কাজের নমুনা যে কী, এবারের ভাঙনও নিঃসন্দেহে তারই উৎকৃষ্ট নমুনা। সরকার বদল হলেও ভাঙন বিধ্বস্ত অসহায় মানুষের আশঙ্কা ও দিন যাপনের গ্লানির রূপটির কোনও বদল নেই। ভাঙন রোধের নামে অপরিকল্পিতভাবে বিপুল পরিমাণ টাকা বিভিন্ন সরকারি খাত থেকে ব্যয় করা হয়েছে। দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন চিত্রের সঙ্গে সেই পাহাড় প্রমাণ অর্থের তুলনা করলে যে কোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হবু রাজা ও গবু মন্ত্রীর রাজত্বে মন্ত্রী থেকে আমলার বিপুল বৈভবের সূত্র অনুমান করতে পারবেন। পুনরায় কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের তৎপরতায় পাহাড় প্রমাণ টাকার পদ্মা ও গঙ্গা প্রাপ্তির তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ('ঝড়' পত্রিকার ৩১ মে সংখ্যা থেকে) ।

শুক্রের সূর্য অতিক্রমণ

বিজ্ঞানচিন্তা প্রসারে ব্রেকথ্রু'র উদ্যোগ

গত ৮ জুন সৌরজগতের এক বিরল ঘটনা শুক্রের সূর্য অতিক্রমণ ঘটে গেল।

এই উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞান সংস্থা 'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি' ঘটনাটিকে ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকমাস ধরে শতাধিক আলোচনা সভা, স্লাইড-শো ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করে —যেখানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। ঘটনার বর্ণনা সম্বলিত বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি তাদের প্রচারপত্র মানুষের মধ্যে এবিষয়ে আগ্রহ তৈরি করে। এর সাথে যুক্ত হয় বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় 'শুক্রের সূর্য অতিক্রমণ' নামক তাদের প্রকাশিত একটি মূল্যবান পুস্তিকা (সংখ্যায় বারো হাজার), যা বিজ্ঞানী-শিক্ষক-অধ্যাপক ও অন্যান্য শিক্ষিত মহলে এবিষয়ে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে। আবার সূর্যের চাকতির ওপর শুক্রগ্রহটিকে দেখতে হলে যে ধরনের বিশেষ ফিল্টার ব্যবহার করা দরকার, যা সূর্যের ক্ষতিকর অবলোহিত রশ্মিকে আটকে দিতে পারে, তেমন শর্ত মেনে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি দর্শকদের চোখের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমেরিকা থেকে বিশেষ ধরনের 'ব্ল্যাক পলিমার' এনে 'সান-ফিল্টার' তৈরি করে, যা দিয়ে লক্ষাধিক মানুষ সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই বিরল দৃশ্য দেখেন ও উপভোগ করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণ

এর জন্য রাজ্য জুড়ে 'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি' শতাধিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে, যেখান থেকে হাজার হাজার মানুষ বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা ঘটনাটি দেখেন। কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হেয়ার স্কুল, খড়্গপুর আই আই টি থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত পাথরপ্রতিমা পর্যন্ত সর্বত্রই ছিল আগ্রহী মানুষের প্রবল ভিড় ও সাগ্রহ অংশগ্রহণ। প্রসঙ্গত কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, ওড়িশা ইত্যাদি রাজ্যেও ছিল মানুষের প্রবল উৎসাহ। সংগঠনের তরফে সাধারণ সম্পাদক ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান এমন এক বৈজ্ঞানিক ঘটনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী নাকি শিক্ষা নিয়ে ভাবিত?

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় হাফ ডজন শিক্ষামন্ত্রী আছেন। আছে বিভিন্ন শিক্ষাদপ্তর। আছে পরিদর্শন ব্যবস্থা। কিন্তু কাজ কী হচ্ছে? এখন পর্যন্ত স্কুলে সরকারের দেয় বইগুলি পৌঁছায়নি। গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, কিছুদিনের মধ্যেই খুলে যাবে স্কুল। তারপরেই ষাণ্মাসিক পরীক্ষা। কিন্তু কী পড়বে ছাত্রছাত্রীরা? কী পড়াবেন মাস্টার মশাইরা? বই আজও ছাপা হয়নি। সিলেবাস পরিবর্তন হয়েছে। অথচ নতুন সিলেবাসের বই দেওয়া হয়নি। ইংরেজি বই নেই, অঙ্ক নেই। ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার আজ আর ভাবিত নন কারণ তাঁরা জনগণের সঙ্গে আছেন, এবং কেন্দ্রের অভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের তদারকি করছেন! শুধু এই তিনটি ক্লাসেই নয় উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস এবছর থেকেই পরিবর্তনের কথা বলে শেষমুহূর্তে বললেন এই সিলেবাস এ বছর পাল্টানো যাবে না। কারণ নতুন সিলেবাস তৈরিই হয়নি। ফলে আরও কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে তিনমাস সময়কেও পড়াশুনার কাজে লাগাতে পারল না। অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সরকারি বই কোন বছরই পায় না। একাংশ পেলেও সময় মত পায় না। উন্নত বামফ্রন্টের উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার এই হল নমুনা। বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রীই না বলেছিলেন শিক্ষা নিয়ে তারা খুব সিরিয়াস! এই মুখ্যমন্ত্রী না স্লোগান তুলেছিলেন, 'ডু ইট নাউ', যা নিয়ে সংবাদ মাধ্যম বুদ্ধবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ!

আঞ্চলিক পার্টি অফিস উদ্বোধন

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকে আমুলিয়া হাটখোলায় গত ৭ জুন এস ইউ সি আই-এর আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন হল। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের লড়াই আন্দোলন পরিচালনার জন্যই দলের কর্মী-সমর্থকরা সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় এই কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। ঐ দিন অফিস উদ্বোধনের পরই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী মালিকতোষণ নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে এলাকার সকল অংশের সাধারণ মানুষকে নিয়ে একটি গণকমিটি গঠিত হয়। ৩৯ জন সদস্যের উপস্থিতিতে ১৪ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড মণীন্দ্রনাথ রায়।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভ, সভা-সমাবেশ

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা মোড়ে ৫ জুন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ইরাক দখল ও ইরাকিদের উপর বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়া শহরের বিশিষ্ট নাগরিক শম্ভুপদ চক্রবর্তী। সভায় বক্তব্য রাখেন এ পি ডি আর-এর সভাপতি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের সদস্য গৌরগোপাল মুখার্জী, গণআন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা জয়দেব পাল, বিদ্যুৎ সীট প্রমুখ। সমস্ত বক্তাই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করে ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানান। মার্কিন মদতে প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলি শাসকদের আগ্রাসী আক্রমণেরও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এই সভা থেকে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইরাকি জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে সভা শেষ হয়।

মুর্শিদাবাদ

৫ জুন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন মদতপুষ্ট ইস্রায়েলের শ্যারণ সরকারের বিরুদ্ধে সারা ভারতের সাথে বহরমপুরেও বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। ব্যানার ফেস্টুনে সজ্জিত শতাধিক কর্মী-সমর্থকদের একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে বাস স্ট্যান্ডে উপস্থিত হয়। সেখানে আবু ঘ্রাইব জেলে ইরাকি বন্দীদের ওপর মার্কিন সেনাদের পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলি শাসক শ্যারনের প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরামের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক কমরেড রায়হান বিশ্বাস, এস ইউ সি আই জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড খাদিজা বানু এবং এস ইউ সি আই-এর লোকাল কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড গৌতম সাহা। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কুশপুতুল পোড়ানো হয়।

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের জবলপুরেও এদিন 'সংহতি দিবস' পালিত হয়। মালবীয় চকে সন্ধ্যা ৬টায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সাম্রাজ্যবাদী খুনি জর্জ বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এস ইউ সি আই-এর জবলপুর জেলা নেতৃবৃন্দ ঐ বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

হরিয়ানা

হরিয়ানার ৬টি জেলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিল সংগঠিত হয়। রোহটক, রেওয়ারি, গুরগাঁও, সোনেপত, কাইথাল, ভিওয়ানি — সর্বত্রই এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে সুসজ্জিত বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে

এম এস এস-এর বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার রাজেন্দ্রচক গ্রামের এক ১৪ বছরের কিশোরী ২৮ মে রাত্রে তার ঘরের দাওয়ায় মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়েছিল। ঐ গ্রামের অরবিন্দ বর সহ তিন দুষ্কৃতী পিস্তল ও ছোরা দেখিয়ে ঐ কিশোরীকে তুলে নিয়ে এসে ধর্ষণ করে। গ্রামবাসীরা মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে থানায় দুষ্কৃতীদের নামে ডায়েরি করে। গ্রামবাসীরা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে থানায় ডেপুটেশন দিয়ে ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানায়। এস ইউ সি আই এগরা লোকাল কমিটি ও মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এগরা থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়। পরে এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন এম এস এস-এর রাজ্য কমিটির সদস্যা কমরেড কল্পনা দাস।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06
R. No 5268 / 60
গণদাবী ১৮ জুন, ২০০৪ ৫৬ বর্ষ / ৪৩ সংখ্যা

কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে এগরায় বাদাম পুড়িয়ে

চাষীদের বিক্ষোভ

গম ও সূর্যমুখী চাষে বিপর্যয়ের পর এবার চীনাবাদাম চাষীদের জীবনে বিপর্যয় নেমে এল। এগরা মহকুমা বন্যাপ্রবণ এলাকা। বন্যার ফলে আমন ধান, পান, সবজি চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাষীরা বিস্তীর্ণ এলাকায় (৪৫০০ একর) বাদাম চাষ করে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু এবারে বাদামের ফলন খুব কম হওয়ায় এবং দাম খুব কম পাওয়ায় চাষীরা হতাশ এবং অসহায়। গত বছর বিঘা প্রতি যেখানে বাদামের ফলন হয়েছিল ৮ থেকে ১০ কুইন্টাল, এবার হয়েছে মাত্র ৩ থেকে ৫ কুইন্টাল। গত বছর চাষীরা দাম পেয়েছিল ২২০০ টাকা কুইন্টাল, এবছর সেই বাদামের দাম ১৪০০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকা কুইন্টাল। অথচ এক বিঘা বাদাম চাষ করতে খরচ ৯৫০০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা। ফলে চাষের খরচটুকুও বাদাম বেচে চাষীরা পাচ্ছেন না। বিপর্যস্ত ও ক্ষুব্ধ বাদামচাষীরা বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির দরজায় দরজায় ঘুরে হতাশ হয়ে এস ইউ সি আই অফিসে এসে আবেদন করেন তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। এস ইউ সি আই-এর কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন (কে কে এম এস) বাদাম চাষীদের সংগঠিত করে আন্দোলনের কর্মসূচি নেয়। ইতিমধ্যে ২ জুন এস ইউ সি আই-এর এগরা লোকাল কমিটির উদ্যোগে বাদাম চাষীদের নিয়ে এগরা মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এস ডি ও এগরা এ বিষয়ে মার্কেট রেগুলেটিং অফিসারকে (এম আর ও) উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

বাদামের দামবৃদ্ধির
দাবীতে MRO'র নিকট
ডেপুটেশন

ছবি ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭-০৬-০৪

৬ জুন কয়েকশ’ বাদাম চাষীর স্বাক্ষর নিয়ে দুই শতাধিক বাদাম চাষী সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে এগরার বীরেন্দ্র মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে ত্রিকোণ পার্কে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও বাদাম জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জীবন দাস, এগরা লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড জগদীশ সাহু, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতা প্রদীপ মাইতি প্রমুখ। এরপর এম আর ও দপ্তরের আধিকারিকের হাতে গণস্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র পেশ করা হয়। এই ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন বাদামচাষী সমীর বেরা, তাপস মাইতি, বিষ্ণুপদ গিরি, অশোক মাইতি প্রমুখ। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, কুইন্টাল প্রতি বাদামের দাম ন্যূনতম ২২০০ টাকা করা, ব্লক ভিত্তিক কৃষি খামার নির্মাণ, সমস্ত বাদাম সরকার কর্তৃক ক্রয় করা, ফসলের বীমাকরণ, দাম না পেলে সরকার কর্তৃক চাষীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রভৃতি। প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় আপাতত সিদ্ধান্ত হয় যে, মহকুমা কৃষি দপ্তর থেকে বাদাম পাইকার ও আড়তদারদের চিঠি দিয়ে জানান হবে যে, কুইন্টাল প্রতি ১৮৫০ টাকার কম যেন বাদামের দাম না নামে।

কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে বাদামচাষীদের এই আন্দোলন এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সাধারণ মানুষ বলছে, এস ইউ সি আই ছাড়া গরিবের পক্ষে আর কোন দল নেই।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমা, তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া থানা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় বাদাম চাষ হয়েছে। বাদাম প্রধান কৃষি ফসলের তালিকাভুক্ত না হওয়ায় এই চাষে সরকারি নজর কম। এই চাষের জন্য শস্যবীমা, সরকারি লোন, পদ্ধতি ও কারিগরি সহায়তা ও অন্যান্য সুবিধা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় না। একথা জানান ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিস্টিকস্-এর স্টেট টেকনিক্যাল কমিটির অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর ও অ্যাগ্রো ইভলিউশান ব্রাঞ্চের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর। এই বিভাগের জেলা অধিকর্তা সহ ১০ জনের এক প্রতিনিধি দল ২ জুন পাঁশকুড়ায় এসেছিলেন বাদামের উপর সমীক্ষা করতে। তাঁরা বলেন, পশ্চিমবাংলায় বহু জায়গায় বাদাম চাষ হলেও কত জমিতে বাদাম চাষ হচ্ছে, উৎপাদনের হার কী এসব তথ্য রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের কাছে নেই।

সূর্যমুখী চাষীদের অবস্থা আজ রাজ্যের মানুষ জানে। ঘাটালের সূর্যমুখী চাষীরা ৯ বিঘা জমির সূর্যমুখী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। কোচবিহারের দিনহাটায় চাষীরা ফলনহীন গমখেত পুড়িয়ে বিক্ষোভ জানিয়েছে।

পর্ষদের মাশুল ঘোষণা

আন্দোলনের চাপে পিছু হঠছে সরকার ও কমিশন

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের মাশুল ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস ১০ জুন নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন —

“রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের যে মাশুল তালিকা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে তাতে কমিশনের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর না থাকায় গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পর্ষদে মাশুল বাড়ানো হয়নি বলে যে প্রচার করা হচ্ছে সেটা সঠিক নয়। কারণ ২০০১-০২ সালে গড় মাশুল ছিল ২.২৭ টাকা বর্তমানে করা হল ৩.২০ টাকা ইউনিট।

আবার তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি তুলে দেবার নীতিকে এখানেও কার্যকর করে গরিব-মধ্যবিত্তের মাশুল বাড়ানো হয়েছে। অপরদিকে বৃহৎ শিল্পপতিদের অনেকটা ছাড় দেওয়া হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের জনাদেশের ভিত্তিতে কৃষি বিদ্যুতের দাম কমার পরিবর্তে বাড়ানো হয়েছে। বেড়েছে মিনিমাম চার্জ। গ্রাহকদের রিবেট কমিয়ে দাম বাড়ানো হয়েছে। শিল্প গ্রাহকের উপর নতুনভাবে মিনিমাম চার্জ চালু করা হচ্ছে।

প্রকৃত ঘটনা হল অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে পর্ষদে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে।

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি যে যেখানে পর্ষদ ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের বণ্টন-সঞ্চালনের ক্ষতির পরিমাণ সিইএসসি’র থেকে বেশি, সেখানে পর্ষদের মাশুলের থেকে সিইএসসি’র মাশুল বেশি করে ধার্য করা হয়েছে ! এটা কেন করা হল ?

তৃতীয়ত, অসুবিধার কথা বলে সিইএসসি’তে যেখানে স্ল্যাব ব্যবস্থার পরিবর্তন করে দাম বাড়ানো হল, সেখানে পর্ষদে পুরানো স্ল্যাবই বজায় রাখা হল কি ভাবে?

প্রকৃত ঘটনা হল, আন্দোলনের চাপে পিছু হঠতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার ও কমিশন। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মাশুল ঘোষণা সে কথাই প্রমাণ করেছে। আমরা রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সম্পূর্ণ দাবি আদায়ের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য আহ্বান করছি।”

পুর পরিষেবার দাবিতে উলুবেড়িয়ায় নাগরিক উদ্যোগ

বামফ্রন্ট শাসনে শহরতলিতে সবুজসমৃদ্ধ বড় বড় আবাসন, বিদেশি ঋণের টাকায় চকচকে উড়ালপুল, অত্যাধুনিক বিনোদন কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে কিন্তু শহরতলি ও মফস্বলের পুরসভাগুলিতে নিকাশি, পথঘাট, আলো, স্যানিটেশন, পানীয় জল সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে। পুর নির্বাচনে যেখানেই এস ইউ সি আই লড়ছে সেখানেই পুরপরিষেবার দাবিতে আন্দোলনের জরুরি প্রয়োজনটিই প্রধান করে তুলে ধরা হচ্ছে।

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। বামফ্রন্ট আমলে গঠিত এই পুরসভার ক্ষমতা ২২ বছর ধরেই সরকারি ‘বামপন্থী’দের হাতে রয়েছে। পানীয় জলের অভাব, ভাঙা অন্ধকার পথঘাট, পুকুরপাড়ের ধস, নিকাশির অব্যবস্থা নাগরিক জীবনকে দুর্বিষহ করে রেখেছে। পৌরবাজার নেই, নেই পৌর গোরস্থান। জেটিঘাটের সংস্কার নেই, রবীন্দ্রভবন অসম্পূর্ণ, অবাধ মদ বিক্রি ও ব্লু ফিল্ম প্রদর্শনী সুস্থ নাগরিক জীবনকে বিষাক্ত করছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে পুরসভার ভূমিকা নেই। কেবল রয়েছে কোটি কোটি টাকা করের বোঝা।

এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত পৌর পরিষেবা ও সুস্থ নাগরিক জীবনের দাবিকে সামনে রেখে জোটবদ্ধ হচ্ছেন উলুবেড়িয়া শহরের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও প্রবীণ বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। গত ৩ জুন উলুবেড়িয়া নোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নাগরিক সভা থেকে প্রবীণ বামপন্থী নেতা জলধর সিংহকে সভাপতি ও এস ইউ সি আই সংগঠক প্রদীপ জানাকে সম্পাদক করে গড়ে উঠেছে উলুবেড়িয়া পুরসভা নির্বাচন পরিচালন কমিটি। এর সাথে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের উৎসাহী ছাত্র-যুবকবৃন্দ। শুরু হয়েছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ব্যাপক দেওয়াল লিখন। অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে কর্মী ও নাগরিক সভা। গত ১০ জুন কুশবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবীণ বামপন্থী নেতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুকুমার বসুর সভাপতিত্বে ও জলধর সিংহের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল নাগরিক সভা। ঐ সভা থেকে স্থানীয় ছাত্র-যুবদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ওয়ার্ড কমিটি। অনুরূপ ভাবে ৪নং ও ৫নং ওয়ার্ডে স্থানীয় ছাত্র-যুব ও নাগরিকদের নিয়ে গঠিত হচ্ছে ওয়ার্ড কমিটি। সব মিলিয়ে উলুবেড়িয়ার নাগরিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা, এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকেরা আবেদন করেছেন, যে সংগ্রামী দলের নেতা-কর্মীরা লাঠি-গুলি-অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে আন্দোলনের ঝাণ্ডাকে বহন করছেন, আসুন ৪, ৫ ও ১০ নং ওয়ার্ডে তাঁদের মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করে পুরসভায় পাঠাই।

কৃষি ক্ষেত্রে বীজ, সার, ফসলের বাজার দর আজ বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে, ফলে অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা চাষীদের শোষণ করে মুনাফার পাহাড় গড়ছে। এ রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও চাষীদের সর্বস্বান্ত করে বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত।

পৌর সমস্যা সমাধানের
আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে
পুরসভা নির্বাচনে
এস ইউ সি আই প্রার্থীদের
বিপুল ভোটে জয়ী করুন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net